গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কটকে সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ২৮ জানুয়ারি ওড়িশার কটকে বালিযাত্রা ময়দানে সারা ভারত মহিলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ। (সংবাদ আগামী সংখ্যায়)

এ ধরনের বন্‌ধ প্রকৃত গণআন্দোলনেরই ক্ষতি করে

তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকা ৩রা ফেব্রুয়ারি বাংলা বন্‌ধের পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩১ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

''কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলছে, নানা খাতে ট্যাক্স বাড়াচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধি করছে। দুই সরকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রামী বামপন্থী রাস্তায় সুসংগঠিত লাগাতার আন্দোলন প্রয়োজন।

একটা দক্ষিণপন্থী দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস হঠাৎ ৩রা ফেব্রুয়ারি যে বন্‌ধ ডেকেছে, সেটা জনগণের স্বার্থে ও গণআন্দোলনের লক্ষ্যে নয়, শুধুমাত্র ভোটে ফায়দা তোলার জন্যই ডেকেছে। এ ধরনের বন্‌ধ জনগণকে বিভ্রান্ত করে বাস্তবে প্রকৃত গণআন্দোলনেরই ক্ষতিসাধন করে। ফলে আমরা এই বন্‌ধ সমর্থন করছি না।''

লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল বেসরকারীকরণের প্রতিবাদ

লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক প্রভাস ঘোষ ২৮ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

''রাজ্যে যখন মানসিক রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং মানসিক রোগীর চিকিৎসার সুযোগও একান্তই কম তখন লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত বিপজ্জনক। বাণিজ্যিক লক্ষ্যে ও মালিকদের লাভের স্বার্থে এই বেসরকারীকরণ সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সামান্যতম সুযোগটুকুকেও কেড়ে নেবে। ইতিমধ্যেই বড়বাজারের মেয়ো হাসপাতাল ও যাদবপুরের বিখ্যাত টি বি হাসপাতালকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোথাও কোনরকম চিকিৎসা পরিষেবা চালু হয়নি।

স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ব্যবসা করার এই সরকারি সিদ্ধান্তের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি ও অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

পঞ্চায়েত কর কৌশলী মিথ্যাপ্রচার

বেশ কিছুদিন ধরে সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে এবং গ্রামে-গঞ্জের বিভিন্ন প্রচারে সি পি এম নেতৃত্ব বোঝাতে চাইছে যে, বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে হাঁস মুরগি গবাদি পশু, সাইকেল প্রভৃতির উপর কর চাপিয়েছে বলে যাঁরা প্রচার করছেন, তাঁরা সত্য বলছেন না। তাঁদের এই সুকৌশলী প্রচার শরৎচন্দ্রের একটি উক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'সমাজধর্মের মূল্য' প্রবন্ধে লিখেছিলেন — ''ভয়ানক মিথ্যা, তদপেক্ষা ভয়ানক সত্যমিথ্যায় মিশাইয়া দেওয়া। কারণ ইহাতে না পারা যায় সহজে মিথ্যাকে বর্জন করা, না যায় নিষ্কলঙ্ক সত্যকে পরিপূর্ণ গ্রহণ করা।'' এদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে কায়েমীস্বার্থবাদীদের লক্ষ করে শরৎচন্দ্র এ উক্তি করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী যুগে সত্যমিথ্যা মিশিয়ে দেওয়ার ভয়ানক প্রবণতা কতদূর পৌঁছতে পারে, তা কেন্দ্রের ও রাজ্যের শাসক দলগুলির প্রতিটি বক্তব্য ও আচরণেই প্রত্যক্ষ করা যায়। আর পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ও সি পি এম নেতারা এই কৌশলকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চলেছে। কী শিক্ষা ক্ষেত্রে, কী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কী শিল্প ক্ষেত্রে সত্যমিথ্যায় মিশিয়ে দেওয়াকে তাঁরা একটি আর্ট-এ পরিণত করেছেন। যেমন, শিল্পক্ষেত্রে কত বিনিয়োগ হয়েছে, কত শিল্প হয়েছে তার পরিসংখ্যানের বন্যায় যখন দেশের মানুষকে মুহ্যমান করার চেষ্টা করছেন, তখন পাশাপাশি কত কারখানা বন্ধ হচ্ছে, কত লোকের চাকরি যাচ্ছে বা কত শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা মালিকরা মেরে দিচ্ছে, কত শ্রমিক আত্মহত্যা করছে অথবা যেসব নতুন তথাকথিত শিল্প গড়ে উঠছে তাতে কী সামান্য সংখ্যক চাকরি হচ্ছে তার কোনও তথ্য তাঁরা দিচ্ছেন না। সর্বশিক্ষা অভিযান করে তাঁরা শিক্ষাকে কত ছড়িয়ে দিচ্ছেন তা জানানোর জন্য প্রচার মাধ্যমে তাঁরা বহু টাকা ব্যয় করছেন, তার একটা অংশ দিয়েই যে বহু স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব বা বাড়ি-বিহীন স্কুলের বাড়ি হওয়া সম্ভব ছিল এসব হিসাব না দেওয়া তাঁদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির নামে তাঁরা যে নয়া কৃষিনীতি চালু করার কথা বলছেন তাতে চাষী যে কার্যত জমির মালিকানা হারাবেন তা তাঁরা সযত্নে গোপন রাখছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের অধুনাতম অবদান হল পঞ্চায়েত স্তরে গৃহপালিত পশু ও সাইকেল, রিক্সা ভ্যান প্রভৃতির উপর কর চালু করার বিষয়টি।

সরকারি ঘোষণার সাথে সাথে এ ব্যাপারে আমাদের দল প্রতিবাদ করেছে। গ্রামাঞ্চলে প্রবল জনরোষের সামনে পড়ে সি পি এম নেতা বিমান

দুয়ের পাতায় দেখুন

কম দামে সরকারি জমি বেচে দিল সরকার

কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকারের বিলগ্নীকরণ মন্ত্রী অরুণ শৌরী রাষ্ট্রায়ত্ত কল কারখানা ও সম্পত্তি জলের দামে বেসরকারি মালিকদের হাতে বেচে দিচ্ছেন। এ নিয়ে এ রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার মুখে প্রতিবাদের সোরগোল যাই করুক, এরাও যে কেন্দ্রীয় সরকারের জুতোতে পা গলিয়ে হাঁটছে সেকথা আজ আর গোপন নেই। এ রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল, হোটেল, জমি, সম্পত্তি বেসরকারি মালিকদের কাছে কম দামে বেচে দেওয়ার ঘটনা রাজ্য সরকার চাপা দিতে চাইলেও সবক্ষেত্রে পারছে না। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের (এন বি এস টি সি) উল্টোডাঙ্গার কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসের দোতলা বাড়ি সহ ১০৪ কাঠা জমি বাজারদরের চেয়ে ৫ কোটি টাকা কম দামে বেচে দেওয়া হয়েছে 'এম এ কনস্ট্রাকশন অ্যাণ্ড ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড' নামে একটি বেসরকারি সংস্থাকে। ঐ সংস্থা ২৪ কোটি ৮১ লাখ টাকায় ঐ জমি ও বাড়ি কিনে 'লক্ষ্মী রিয়েলটর্স প্রাইভেট লিমিটেড' নামে এক প্রোমোটার সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে। জমিটিকে যে বাজারদরের চেয়ে ৫ কোটি টাকা কম দামে রাজ্য পরিবহন দপ্তর তথা রাজ্য সরকার বিক্রি করেছে, এ অভিযোগ করেছেন স্বয়ং রাজ্যের আই জি (রেজিস্ট্রেশন) সব্যসাচী সেন (আনন্দবাজার ২৯-১-০৪)। ওখানে এখন জমির দাম কাঠা প্রতি ২৬ লাখ টাকা। জমি যে কম দামে বিক্রি করা হয়েছে তা অস্বীকার করেননি এন বি এস টি সি'র চেয়ারম্যান, সি পি এম-এর বিধায়ক সুধীর প্রামাণিকও। তিনি অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি হিসাবে বলেছেন, 'কি আর করা যাবে ! আমাদের অভাব রয়েছে, তাই যা পেয়েছি বাধ্য হয়ে মানতে হয়েছে'।

সম্পত্তিটা যখন সরকারের অর্থাৎ জনগণের, তখন ইচ্ছামত কোনও সরকারি দপ্তর তা বেচে দিতে পারে কি? 'টাকার প্রয়োজন আছে' এই যুক্তিতে বরং এমন একটি বহুমূল্যবান জমি কম দামে বিক্রি না করাই সমীচীন। এভাবে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রি করার পিছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে। হয় সরকার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, না হয় এর পিছনে স্বজনপোষণ কাজ করছে। পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ

আটের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত কর

কৌশলী মিথ্যা প্রচার

একের পাতার পর

বসু, অনিল বিশ্বাস থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা সাফাই গেয়ে বলছেন তাঁরা নাকি এ ধরনের কর বসানোর কথা বলেননি। এমনকি তাঁরা চ্যালেঞ্জ করে একথাও বলছেন যে, তাঁদের সরকার কর বসিয়েছে, অভিযোগকারীরা একথা প্রমাণ করুক! তাঁরা ভাব দেখাচ্ছেন যেন প্রমাণ হলে তাঁরা মন্ত্রীত্ব না ছাড়লেও তার কাছাকাছি বড় রকম কিছু করবেন! এর দ্বারা তাঁরা বোঝাতে চাইছেন তাঁদের চ্যালেঞ্জ ফাঁকা আওয়াজ নয়। সি পি এম নেতৃত্ব প্রচারমাধ্যমকে একথাও বলছেন — বিরোধীরা একেবারে হস্তীমূর্খ, তারা নিজেরাও কিছু জানে না, জনগণকেও তারা ভুল বোঝাচ্ছে। গ্রাম-গঞ্জে পথসভা, মাইক প্রচার করে তাঁরা বলছেন — ''এস ইউ সি দল মিথ্যা প্রচার করছে, সরকার এ ধরনের কর বসায় নি।'' তাঁদের এই দাবি যে ঠিক নয়, তা তুলে ধরে ইতিপূর্বে এই পত্রিকায় প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রচারকৌশলের জট খুলতে, সত্যমিথ্যায় মেশানো প্রচার থেকে সত্যটাকে ছেঁকে বুঝে নিতে হলে তাঁদের চালাকিটা আর একটু পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন হল — এ ব্যাপারে সত্য কি? সত্য হল, তাঁরা পঞ্চায়েতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কাজটা করতে চাইছেন। সি পি এমের মুখপত্র গণশক্তি বলছে ''পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও জোরদার, জনমুখী এবং সক্রিয় করে তোলার জন্য প্রয়োজন অর্থ। সরকারি অনুদান বহাল আছে। কিন্তু এই অর্থ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যথেষ্ট নয়। পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও, জনসাধারণের দাবি অনুযায়ী সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না সর্বত্র। এই অবস্থায় নিজস্ব কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য পঞ্চায়েত অর্থ সংগ্রহ করবে কী না, যদি করে তবে কোন্ খাতে কীভাবে তা সংগ্রহ করবে সে সম্পর্কে পঞ্চায়েতকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'' (সম্পাদকীয় গণশক্তি, ২৪-১-২০০৪)

অর্থাৎ পঞ্চায়েতকেই তার অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার যে নির্দেশনামা পাঠিয়েছে তাতে বলা হয়েছে — ''একথা অনস্বীকার্য যে, কোন পঞ্চায়েত শুধুমাত্র সরকারি অনুদানের উপর নির্ভর করলে বা সরকার থেকে নির্দিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখলে সেই এলাকার জনসাধারণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য নিজেদের উদ্যোগে কোন বিশেষ প্রকল্প রূপায়ণ কখনই সম্ভবপর হবে না, যদি পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল না থাকে।'' এখন এই নিজস্ব তহবিলে টাকা আসবে কোথা থেকে? এর উত্তরে তাঁরা বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হয়ে পঞ্চায়েতকে নিজস্ব আয়ের উৎস খুঁজে নিতে হবে।' এই আয়ের উৎস তারা কীভাবে পাবে ও অর্থসংগ্রহ করবে তার উপায়ও সরকারই বাতলে দিয়েছে। প্রথমে তাঁরা বলেছে, ১৯৭৩ সালের ৪৩ ধারা অনুসারে উপবিধি (by law) তৈরি করে পঞ্চায়েত নিজস্ব আয়ের সংস্থান করতে পারে। কিন্তু তাঁরা এখানেই থেমে যাননি, আরও বলেছেন 'পঞ্চায়েতি আইনের ২২৩ ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েতকে উপবিধি তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।' আবার এও বলেছেন ''২০০৩ সালের আইন অনুসারে এই উপবিধি তৈরি করা আবশ্যিক করা হয়েছে।'' অর্থাৎ কোন পঞ্চায়েতের ইচ্ছা থাকুক বা না-থাকুক পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পঞ্চায়েত এই উপবিধি তৈরি করে আয়ের উৎস খুঁজে নিয়ে সম্পদ সংগ্রহের জন্য বাধ্য থাকবে। তাই তাঁরা সকল পঞ্চায়েতকে জানিয়েছেন যে — ''প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতকে আগামী তিন মাসের মধ্যে উপরোক্ত আদর্শ উপবিধি অনুসারে নিজস্ব উপবিধি তৈরি করতে হবে এবং ঐ উপবিধির অনুলিপি জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অবগতির জন্য পাঠাতে হবে।'' পঞ্চায়েত সচিব মানবেন্দ্র রায় (১৪/১০/০৩) স্বাক্ষরিত স্মারকপত্র বা নির্দেশনামার বক্তব্য মোটামুটি এরকম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি কি বিষয়ের উপর উপবিধি অনুসারে এই কর বা অভিকর বা উপশুল্ক ধার্য হবে? তার একটা তালিকা আমরা আগেই গণদাবীতে প্রকাশ করেছি — সেগুলি হল হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু, রিক্সা, অটোরিক্সা, ঠেলাগাড়ি, ভ্যান, সাইকেল, পশুবাহিত গাড়ি। তাছাড়া বিভিন্ন দেবস্থান বা তীর্থস্থান, মেলা, পানীয় জল, সেচের জল, রাস্তার আলো, সেপটিক ট্যাঙ্ক, সেতু, শ্মশানঘাট, পাম্পসেট, ম্যাটাডোর, ট্রাক্টর, স্কুটার, মোটর সাইকেল ইত্যাদি ইত্যাদি।

সর্বশেষে তাঁরা বলেছেন, যদি কেউ এই উপবিধি ভঙ্গ করে অর্থাৎ, এই কর, অভিকর উপশুল্ক আদায় করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে দণ্ড দেওয়া হবে। বলা হয়েছে, ''পঞ্চায়েত আইনের ২২৩ ধারার ৩(১) উপধারা অনুযায়ী প্রণীত এই উপবিধি ভঙ্গ/অমান্য করলে, দোষী সাব্যস্ত হলে প্রথমবারের জন্য সর্বোচ্চ একশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে এবং এই দণ্ডদানের পরও উপবিধি একইভাবে ভঙ্গ করতে থাকলে বিধিভঙ্গের দরুণ দোষী ব্যক্তিকে প্রতিদিনের জন্য কুড়ি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত দণ্ড দিতে হবে। এবং আদায়ীকৃত অর্থদণ্ড গ্রামপঞ্চায়েতের তহবিলে জমা হবে।'' এই হল বামফ্রন্টের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ও তার মাধ্যমে আয়ের উৎস খুঁজে নিয়ে অর্থ সংগ্রহের বিবরণ।

তাহলে আমরা কী পেলাম? আমরা দেখছি, সরকার সরাসরি কর বসাতে বলেনি ঠিক, কিন্তু পঞ্চায়েতকে তার আয়ের উৎস খুঁজে নিতে বলেছে। আর এই আয়ের উৎস খুঁজে বের করে সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য উপবিধি তৈরি করা আবশ্যিক করা হয়েছে। কেউ উপবিধি না মানলে তিনি অবশ্যই দণ্ডনীয় হবেন। অপর বিষয় যেটা সরকার এই স্মারকপত্রে কৌশলে বলেছে, তা হল, সরকার পঞ্চায়েতগুলির বরাদ্দ অর্থ ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছে এবং আরও দেবে। তাই পঞ্চায়েতের নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের এ ধরনের ব্যবস্থা তারা নিতে চলেছে। এর অর্থ প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে এই কর বসাতে কার্যত বাধ্য করা হল। কিন্তু এ তো লিখিত কথা, এরপরও যে অলিখিত কথা, যা তারা পৌর এলাকা সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার ক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন ধরে বলে আসছেন, তা হল, এসব স্বশাসিত সংস্থাগুলি সরকারের এসব নির্দেশ যদি অমান্য করে তাহলে সরকার তাদের বরাদ্দ অর্থ বন্ধ করে দেবে। এই মূল কথাটি গোপন করে 'সরকার সরাসরি কোন কর বসায়নি' এই অর্ধসত্য, যা মিথ্যার চেয়েও ভয়ানক, সেটাই তাঁরা বলছেন অর্থাৎ ভাতে মেরে তাঁরা পঞ্চায়েতগুলিকে বাধ্য করছেন হাঁসমুরগি গরু ছাগল সাইকেলের ওপর ট্যাক্স বসাতে। আর জনগণকে বলছেন, ''আমরা এরকম কোন কর বসাচ্ছি না।'' এইভাবে সত্য মিথ্যায় মিশাল দিয়ে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার জনগণকে ভয়ানকভাবে বিভ্রান্ত করছে। মিথ্যা বলা অপরাধ, কিন্তু এই চালাকি তার চেয়েও বড় অপরাধ।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

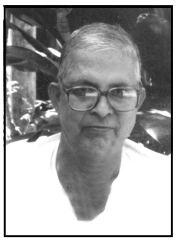

মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল-২ এলাকার দীর্ঘদিনের এস ইউ সি আই কর্মী এবং প্রাথমিক শিক্ষক নেতা কমরেড লাবণ্য সাহা ফুসফুসের রোগে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ১৫ জানুয়ারি বেনেখালি গ্রামে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৬০-এর দশকের মধ্যভাগে মুর্শিদাবাদ জেলায় এস ইউ সি আই সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেড মাধব রায়চৌধুরির সংস্পর্শে এসে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। ডোমকলে দলের সাংগঠনিক কমিটি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

তাঁর মরদেহ বহরমপুরে দলের জেলা অফিসের সামনে আনা হলে দলের জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল, জেলা কমিটির উপস্থিত সদস্যরা এবং দলের কর্মীরা মাল্যদান করেন ও এক মিনিট নীরবতা পালন করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড লাবণ্য সাহা লাল সেলাম

মদের ঢালাও লাইসেন্সের প্রতিবাদে রামপুরহাটে যুব কনভেনশন

ঢালাও মদের লাইসেন্স, লাইসেন্সহীন 'রেডি টু ড্রিঙ্ক' নামক মদ বিক্রির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং বেকারদের চাকরি, স্বল্প সুদে সরল পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক ঋণ, বেকারভাতা ইত্যাদির দাবিতে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রামপুরহাট জে এল বিদ্যাভবনে এক যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড মুবসালিম হক। প্রস্তাবের সমর্থনে ৬ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা কমরেড মানস সিংহ তাঁর বক্তব্যে যুবজীবনের ভয়াবহ সমস্যার নানা দিক তুলে ধরে বলেন, যুবজীবনের জ্বলন্ত সমস্যার বিরুদ্ধে যাতে যুব সমাজ সঠিক পথে উন্নত মূল্যবোধের ভিত্তিতে আন্দোলনের পথে অগ্রসর না হতে পারে, সেজন্য তাদের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করতে ঢালাও মদের ও অপসংস্কৃতির আমদানি করা হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভা শেষে মুবসালিম হককে সভাপতি ও আব্দুল আলিমকে সম্পাদক করে ১০ জনের আঞ্চলিক ডি-ওয়াই-ও কমিটি গঠিত হয়।

বীরভূমে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির বীরভূম জেলার রামপুরহাট শাখার উদ্যোগে গত ২০ জানুয়ারি রামপুরহাট ডি ই দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। ভুয়ো বিল বন্ধ, বিনা নোটিশে লাইন না কাটা, কৃষিতে অস্থায়ী কানেকশন কমপক্ষে ৬ মাস করা, গ্রাহকদের হয়রানি বন্ধ করা এবং বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, বেসরকারীকরণ-বাণিজ্যিকীকরণের ও জনবিরোধী 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' বাতিলের দাবিতে এক সুসজ্জিত মিছিল টাউন হল প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে শহর পরিক্রমার পর ডি-ই দপ্তরে পৌঁছায়। সমিতির পক্ষে প্রিয়শঙ্কর ব্যানার্জী, রঞ্জিত দাস, নুরুল ইসলাম, ফজর আলী, মহিউদ্দিন মণ্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ডি-ই'র সাথে আলোচনার পর স্থানীয় নির্দিষ্ট দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে ফিরে এসে উপস্থিত জনতাকে সেই কথা বলেন এবং অন্যান্য দাবি পূরণে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির কলকাতা জেলা সম্মেলন

নিত্যনতুন স্বনিযুক্তির ভাঁওতা নয়, চাই সকলের জন্য কাজ, বিভিন্ন স্কীমের স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পভুক্তদের ওপর ব্যাঙ্ক ও প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করা, রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প ইউনিটগুলির শ্রমিকদের পুনর্বাসন সহ দশ দফা দাবিতে ১৮ জানুয়ারি কলকাতার তালতলা হাইস্কুলে স্ব-নিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির কলকাতা জেলার তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ বেদীতে মাল্যদান-এর মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন জেলা কমিটির সদস্য প্রসাদ ঘোষ, প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক সুরথ সরকার। আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সমর মজুমদার।

সম্মেলনে বিভিন্ন এলাকার ঋণগ্রহীতারা সরকারের ভ্রান্তনীতির ওপর আলোচনা করেন এবং আন্দোলন সুদৃঢ় করার আহ্বান জানান। লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে আইনজীবী জায়েদ সেখ ঋণগ্রহীতাদের আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া সমিতির রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য দীপক ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন থেকে মুশম্মাদ মোল্লাকে সভাপতি এবং সুরথ সরকারকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৮ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

বাংলার তাঁত

তাঁতশিল্পীরা আজ মৃত্যুর দরজায়

হস্তচালিত তাঁতের ঠকাঠক শব্দে সারা গ্রাম দিনরাত্রি মুখরিত থাকত। এমনি একটি গ্রামের নাম বহিচাড়। পূর্বমেদিনীপুর জেলা শহর তমলুক থেকে দু'কিলোমিটার দূরে এই গ্রামটি। ঘরে ঘরে দু'টি তিনটি করে তাঁতযন্ত্র। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সবাই তাঁত চালাত। বাড়ির ছ-সাত বছরের ছেলেমেয়েরাও চরকায় নলি পাকিয়ে (মাকুর মধ্যে অবস্থিত সুতোভরা কাটিম) সাহায্য করত। এ গ্রামে আজ আর কোন তাঁতের শব্দ নেই। সমস্ত তাঁতই প্রায় বন্ধ। এই গ্রামের প্রবীণ অভিজ্ঞ তাঁত শিল্পী পঞ্চানন মান্না দীর্ঘ ৪০ বছর তাঁতকে জীবিকা করে বেঁচে আছেন। তাঁর বাড়ির পাঁচটি তাঁতযন্ত্রই বর্তমানে বন্ধ। গ্রামে শতাধিক তাঁতযন্ত্র রয়েছে। পঞ্চানন মান্না বলেন — তাঁতের সমস্যা ৮০'র দশকের শুরু থেকে এবং তা দিন দিন বাড়ছিল। কিন্তু এ বছরের মত এত চরম সঙ্কট অতীতে কোনদিন আসেনি। সুতোর দাম বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে আবার কমেছেও, কিন্তু ২০০২ সালের দুর্গাপূজার আগে থেকে সুতোর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে বাড়তে ২০০৩ সালের দুর্গাপূজা পর্যন্ত বাণ্ডিলে ২০০ টাকার বেশি বেড়ে যায়। অপরদিকে তাঁতের কাপড়, বেডশিট, লুঙ্গি-শাড়ি, লেপ-তোষকের টিকিন (পাট্টা) আর তেমন বিক্রি হচ্ছে না, ফলে সুতো কিনে তাঁতিরা যে কাপড় বুনে বাজারে বিক্রি করত তার বাজার নেই। যদি বা কিছু বিক্রি হয় তা একদম জলের দরে পাইকাররা কিনে নেয়। সুতোর দামটুকুও তাঁতিরা পায়না। কিছু তাঁতি মহাজনের কাছ থেকে সুতো নিয়ে মহাজনের অর্ডারি মাল বুনে দিয়ে পিস প্রতি অল্পকিছু মজুরি পেত, কিন্তু বাজার সঙ্কটে মহাজনরাও ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁত আঁকড়ে থেকে আজ আর প্রাণ বাঁচানো যাচ্ছে না। তাঁতশিল্পী যুবকদের অনেকেই গুজরাট, রাজস্থান, বোম্বে, হায়দ্রাবাদ, নেপালে কাজের খোঁজে চলে গেছে। তাঁত চললে কোনরকমে ফ্যান ভাত আর আলুভাতে জুটত, এখন সেটুকুও নেই। ঘরে ঘরে আজ হাহাকার আর হতাশা। অপুষ্টি, অনাহার, দুর্ভিক্ষের ছায়া তাঁতশিল্পীদের ঘরে ঘরে।

মেদিনীপুর জেলায় হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সংখ্যা একসময় ছিল ৪০-৪৫ হাজার। হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা মিলে তাঁতশিল্পের সংখ্যা ছিল ৮০-৮৫ হাজার। বাংলার তাঁতের ধুতি, শাড়ি, চাদর, মশারি, বিছানার চাদরের ভারতবর্ষে শুধু নয়, বহির্ভারতেও খুবই নামডাক ছিল। আজ এই শিল্প সরকারি অবহেলায় এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের লুণ্ঠনের কবলে পড়ে বিলীন হতে চলেছে। তাঁত শিল্পের সংকটের কারণগুলির মধ্যে একটি প্রধান কারণ সুতোর অত্যধিক দামবৃদ্ধি। সুতোর বাজারের নিয়ন্ত্রণ সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফলে এই দামবৃদ্ধি।

তাঁতশিল্পের সঙ্কটের আর একটি বড় কারণ সিন্থেটিক কাপড়ের উৎপাদন। পলিয়েস্টারের শাড়ি, ধুতি, বেডশিট, লুঙ্গি এবং নাইলনের মশারি সূতির কাপড়ের বিকল্প হিসাবে অনেকটাই বাজার দখল করে নিয়েছে। পূর্বমেদিনীপুরের রাধামণি বাজারের সুতোর মশারি, বেডশিটের বিপুল চাহিদা শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, আসাম, বিহার, ওড়িশা সহ অন্যান্য রাজ্যেও ছিল। সে বাজার আজ মৃত। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অমোঘ নিয়মই হল ক্ষুদ্রশিল্প-কুটির শিল্প গ্রাস করে যন্ত্রশিল্পের বিকাশ। অসংখ্য ক্ষুদ্র পুঁজিকে গিলে খেয়ে পুষ্ট হয় বৃহৎ পুঁজি। এই হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির জঙ্গলের আইন, যা মার্কস দেখিয়েছেন দেড়শো বছর আগে। এই নিয়মেই গড়ে উঠেছে ভারতের অত্যাধুনিক বস্ত্রশিল্প — ডি সি এম, রেমণ্ড, মফৎলাল ইত্যাদি। সিন্থেটিক পলিয়েস্টারের একচেটিয়া কারবার রিলায়েন্স-এর, এদের উত্থানের তলায় চাপা পড়েছে তাঁতশিল্পীর কান্না। শিল্পী তাঁতি মরে জন্ম নিয়েছে টেক্সটাইল মিলের হাজার হাজার মজুর, তেজি বাজারে যাদের শ্রম নিংড়ে নিচ্ছে মালিক, আর মন্দা বাজারে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে কারখানার বাইরে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পকে রক্ষা করার জন্য কিছু চেষ্টা যে করেছিল তাও পুঁজিবাদেরই সামগ্রিক স্বার্থে। ক্ষুদ্রশিল্পকে রক্ষা না করলে কোটি কোটি মানুষ এক ধাক্কায় বেকার হবে যা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাই একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, কিছু পণ্য সংরক্ষিত ছিল ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য যা একচেটিয়া সংস্থা উৎপাদন করতে পারত না। স্বাধীনতার পর ক্ষুদ্র শিল্পের সংরক্ষণ, যা পুঁজিবাদের স্বার্থেই করা হয়েছিল, তা আজ পুঁজিবাদের স্বার্থেই তুলে দেওয়া হচ্ছে। গত পঞ্চাশ বছরে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি বিপুল শক্তি অর্জন করেছে। প্রতিটি পণ্যই তার কবলে। ক্ষুদ্র বিস্কুট, সাবান, তেল, নুনের শিল্প এখন মৃত্যুমুখে, এসবের কারবার করছে টাটা, গোদরেজ, আই টি সি। গামছার বদলে তোয়ালে করছে ডি সি এম, সিন্থেটিক শাড়ি করছে রিলায়েন্সের সংস্থা বিমল, পাকা তাঁতি বুনছে গজ ব্যাণ্ডেজ, সস্তার গামছা — তাও আর কতদিন কেউ জানে না। কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশানাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন (এন টি সি) তুলে দিচ্ছে। এ কাজে রাজ্য সরকার তার সাহায্যকারী। রাজ্য সরকার নিজে তন্তুজ, তন্তুশ্রী, নানা সমবায় সংস্থা করে তাঁতিদের যতটা সাহায্য দিত এখন তা দ্রুত কমাচ্ছে। বিশ্বায়নে গা ভাসিয়ে রাজ্যের সি পি এম সরকারও এখন একচেটিয়া ঘেঁষা নীতি নিচ্ছে। সরকারি 'ব্যয় সঙ্কোচনের' কোপে পড়ছে তন্তুশ্রী, তন্তুজ প্রমুখ সমবায়গুলি, মরছে বাংলার তাঁতি।

হস্তচালিত তাঁতশিল্পীদের সাহায্যের জন্য পশ্চিমবাংলায় ২২০৪টি হ্যাণ্ডলুম সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছিল। সমিতিগুলি তাঁতশিল্পীদের কম সুদে ঋণ এবং সুতো সরবরাহ করত, তাঁতজাত পণ্য কিনে নিয়ে সরকারি বিপণন সংস্থাকে সরবরাহ করত। সরকারি নানা অর্ডার সাপ্লাই করত। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমবায়গুলিও একদিকে যেমন ব্যাঙ্কিং পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা লুণ্ঠনের জায়গা, আবার এই সমবায়গুলি কায়েমী স্বার্থবাদীদের আধিপত্য ও লুণ্ঠনেরও জায়গা। নানা দুর্নীতি চুরি ও কারচুপির মধ্য দিয়ে সমবায়গুলির কোটি কোটি টাকা কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের পকেটস্থ হয়। তাঁতশিল্পীদেরও এই সমবায়গুলি শোষণ করে। ফলে আজ খাতা কলমে ৬৬৮-টি সমবায় বেঁচে থাকলেও মাত্র ১০০টি সমবায় কোনরকমে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। (প্রতিদিন ১৫-১২-০৩)

ঠিক একইভাবে সরকারের খাদি গ্রামোদ্যোগ প্রকল্প, তন্তুজ, তন্তুশ্রী, মঞ্জুষা প্রভৃতি বিপণন সংস্থা ও প্রকল্পগুলি কায়েমী স্বার্থবাদী ও মন্ত্রী-আমলাদের চুরি-দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্র। কোটি কোটি টাকা এই পথে চলে যায়। তাঁতশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে। অনুদান, ভরতুকি নীতি সরকার পরিবর্তন করেছে, লাভজনক উৎপাদন ছাড়া পুঁজিবিনিয়োগ করা চলবে না, এই নীতিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এখন চলছে। ফলে তাঁতশিল্প ও তাঁতিদের বাঁচানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আর নেই। এখন লোকসভা নির্বাচনের মুখে কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকার বলছে হ্যাণ্ডলুম শিল্পকে বাঁচানোর জন্য মিনি বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এ বছর ৪০ কোটি টাকা এবং পরের বছর ৬০ কোটি টাকা হ্যাণ্ডলুমের জন্য সরকার দেবে। আসলে ঐ টাকা যদি দেয়ও তবে তা গরিব তাঁতিদের হাত পর্যন্ত পৌঁছবে না। তার আগে মন্ত্রী-আমলারা পকেটস্থ করবে। তারপর যদি কিছু আসে তা সমবায়গুলি মারফৎ দেওয়া হবে এবং সেই সমবায়গুলির দুর্নীতির গহ্বরে এ টাকা হারিয়ে যাবে।

পশ্চিমবাংলার সি পি এম ফ্রন্ট সরকারও এই তাঁতশিল্পীদের উপর কতটা নির্দয় এবং অমানবিক তা একটি ঘটনা থেকে প্রমাণিত। এই সরকার বেকারদের চাকরি দিতে পারবে না। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বেকারদের সাহায্য করার গালভরা প্রতিশ্রুতি তারা দিচ্ছে অথচ বাস্তবে যে তাঁতশিল্পীরা স্বনির্ভর ছিল আজ চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে দিশাহারা হয়ে তারা ছুটছে বিকল্প কর্মের খোঁজে। এদের বাঁচিয়ে রাখার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই। ২০০০ সালের বন্যায় যে সব তাঁতশিল্পী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারকে দেয়। রাজ্য সরকার এই টাকা তাঁতশিল্পীদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত বণ্টন করেনি। রাজ্যের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১২৯৮ জন তাঁতশিল্পীর প্রত্যেকের ৩৫ হাজার টাকা করে পাওয়ার কথা। এই ৩৫ হাজার টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ১৮ হাজার টাকা। কেন্দ্র সরকার (অর্ডার নং ২/১৩/৯৭ ডি সি এইচ তাং ১৬/১১/২০০০ এবং অর্ডার নং ২/১৩/৯৩ ডি সি এইচ তাং ৩০/৩/২০০১) দু'কিস্তিতে ২.৬৯ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দিয়েছে। এই টাকা যে রাজ্য সরকার তুলে নিয়েছে তা স্বীকার করেছেন রাজ্য হস্তচালিত তাঁত ও বস্ত্র অধিকর্তা মলয় দাস। কিন্তু রাজ্য সরকারের দেয় টাকা রাজ্য সরকার দিতে পারছে না বলে ঐ টাকা তাঁতশিল্পীদের মধ্যে বণ্টন করা যায় নি। (বর্তমান ২৩/১২/২০০৩)

তাঁতশিল্পীদের জীবনে চরম সঙ্কট চলছে অথচ বন্যার পর ৩ বছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও বন্যায় খয়রাতির সাহায্যটুকুও রাজ্য সরকার তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে না। এর মধ্যে সাহায্য প্রাপকের তালিকায় নাম থাকা অনেক তাঁতশিল্পী মারা গেছেন।

এইসব সঙ্কটে এ রাজ্যের অসংখ্য তাঁতশিল্পের আজ পর্যন্ত কতগুলির অস্তিত্ব আছে রাজ্য সরকারের কাছে তার কোন হিসাব নেই। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার রাধামণিবাজার তাঁতের কাপড় গামছা, শাড়ি, চাদর, মশারি, বেডশিট এবং সুতো প্রভৃতির দক্ষিণবঙ্গের একটি বৃহত্তম বাজার। এখান থেকে তাঁতজাত পণ্য হাওড়ার মঙ্গলাহাট থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ, বিহার, আসাম, ওড়িশাতেই শুধু যায় না, বিদেশেও রপ্তানি হয়। এই বাজারে সপ্তাহে দু'কোটি টাকার ব্যবসা হতো। এখন বাজারে দু'লক্ষ টাকার ব্যবসা হয়না বললেই চলে। এক অভিজ্ঞ তাঁতের জিনিসের ব্যবসায়ী বলেন, পাওয়ার লুমের উপর নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ায় হ্যাণ্ডলুমের পণ্য ভীষণভাবে মার খাচ্ছে। এতদিন রাজস্থানের জয়পুরের ছাপা বেডশিট, বিহারের গয়ার পাওয়ারলুমের লেপ তোষকের টিকিন (পাট্টা) — পশ্চিমবাংলার হ্যাণ্ডলুম শুধু নয়, পাওয়ারলুম কারখানারও সঙ্কট সৃষ্টি করছিল। তার উপর সুতোর এই অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি তাঁতশিল্পের কার্যত মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে।

সুতো এখন পুরোপুরি একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় এ নিয়ে ফাটকা ব্যবসা চলছে ব্যাপক। ১৯৮৮ সালে রাধামণি বাজারে ব্যবসায়ীরা একদিনে তিন বার সুতোর মূল্যবৃদ্ধি করায় বাজারে আসা হাজার হাজার তাঁত শিল্পী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং সুতোর দোকানগুলি অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। সুতোব্যবসায়ীরা তাদের পোষা মস্তানবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে তাঁতশিল্পীদের মারধর করে এবং পুলিশ এনে সুতো লুটপাটের মিথ্যা কেসে শতাধিক তাঁতশিল্পীকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। সেদিন এস ইউ সি আই দলের উদ্যোগে গড়ে ওঠা তাঁতশিল্পীদের সংগঠন তাঁতশিল্পী সমবায় কমিটি, তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে প্রশাসনকে দিয়ে তাঁতিদের উপর থেকে মিথ্যা কেস প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিল এবং দোকানে সুতোর দামের চার্ট ও স্টক টাঙানো, অত্যাবশ্যক পণ্য হিসাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত দামে সুতো সরবরাহ ও বাজারে মিনি মার্কেট নির্মাণ প্রভৃতি দাবি আদায় করেছিল। কিছুদিন এই ব্যবস্থা চলেছিল। সরকারি নজরদারি শিথিল হওয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়।

বৃহৎ পুঁজির গ্রাসে তাঁতশিল্পী ধীরে ধীরে নিশ্চিতভাবে মরছিল পুঁজিবাদের নির্মম নিয়মেই, খোলাবাজার নীতি সেই মৃত্যুকে আরও ঘনিয়ে আনছে, সঙ্কট বাড়াচ্ছে দ্রুত হারে। অসংগঠিত তাঁতশিল্পীরা আজ মৃত্যুর মুখোমুখি। আন্দোলনই তাঁদের বাঁচার একমাত্র রাস্তা। পুঁজিবাদের এই সর্বগ্রাসী সঙ্কটের বিরুদ্ধে দেশের সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁতশিল্পীদেরও আজ লড়াই-এ সামিল হতে হবে। গণআন্দোলনের প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করে আন্দোলনের চাপেই তাঁতশিল্পীদের বাঁচার দাবি আদায় করতে হবে। এছাড়া বিকল্প অন্য কোন পথ নেই।

নদীয়া জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

২৪ জানুয়ারি কৃষ্ণনগর টাউন হলে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা)'র নদীয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার প্রতিটি থানা ও ইলেকট্রিক সাপ্লাই সেক্টর থেকে ২৩৪ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। ৩০ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধি সম্মেলন থেকে নিমাই গড়াই এবং তপন ঘোষকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন করে ৩৭ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। এরপর সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাসের আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন শেষ হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনে কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ জামান উপস্থিত ছিলেন।

বিকালে চার শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক ও বিভিন্ন স্তরের জনগণ প্রকাশ্য সমাবেশে সমবেত হন। সভাপতিত্ব করেন মদনপুর আঞ্চলিক কমিটির বিশিষ্ট সংগঠক অসীম ঘোষ। সভায় শান্তিপুরের ডাঃ গৌতম পাল, ড. এ জামান, নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব্ কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি প্রণব চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা সঞ্জিত বিশ্বাস দীর্ঘ আলোচনায় বিশ্লেষণ করে দেখান, কীভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়েই অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি করছে। তিনি এও দেখান, কীভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বড় বড় কারখানার মালিকদের হাজার হাজার কোটি টাকার মাশুল ছাড় দিয়ে বা আদায় না করে তার সম্পূর্ণ বোঝা সাধারণ গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে ক্রমাগত বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করে চলেছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত স্তরের বিদ্যুৎগ্রাহকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে লাগাতার আন্দোলন — প্রয়োজন হলে লাগাতার বিল বয়কট করে সরকারকে বিদ্যুতের মূল্য কমাতে ও ২০০৩-এর বিদ্যুৎ আইন বাতিল করতে বাধ্য করার জন্য আহ্বান জানান।

২৪ জানুয়ারি নদীয়া জেলা বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস

মদ বিক্রি বন্ধের দাবিতে মহিলা ডেপুটেশন

তমলুক থানার রঘুনাথপুর গ্রামপঞ্চায়েতে চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রি অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে সোচ্চার হলেন এলাকার মহিলারা। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ২১ জানুয়ারি পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে মহিলারা এই দাবি জানান। পঞ্চায়েত প্রধান চোলাই মদ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং লাইসেন্সভুক্ত কোন মদের দোকানও খুলতে দেবেন না জানান। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন শীলা দাস, অসীমা পাহাড়ী, বেলা পাঁজা, নমিতা সামন্ত, মায়া সামন্ত, কানন সামন্ত।

প্রবীণ শ্রমিক সংগঠকের জীবনাবসান

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত চা-শ্রমিকদের একমাত্র সংগ্রামী সংগঠন নর্থ বেঙ্গল টী প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রবীণ নেতা এবং এস ইউ সি আই সদস্য কমরেড গ্যাব্রিয়েল লাল গত ১৮ জানুয়ারি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষার ভিত্তিতে প্রয়াত কমরেড উৎপল রায়ের উদ্যোগে ১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গে চা-শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু হয় জলপাইগুড়ি জেলার রামঝোড়া চা বাগানে। সেই শুরুর দিনগুলিতে, যখন এস ইউ সি আই-এর পরিচিতি প্রায় নেই বললেই চলে, চা-শ্রমিকদের মধ্যে তৎকালীন সোস্যালিস্ট পার্টির প্রবল প্রভাব, সেই সময় যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কমরেড ঘোষের বৈপ্লবিক আদর্শের ভিত্তিতে একটা নতুন ইউনিয়ন গড়ার কাজে এগিয়ে আসেন, কমরেড গ্যাব্রিয়েল তাঁর অন্যতম। দল এবং ইউনিয়ন গড়তে গিয়ে অন্যান্যদের সাথে তিনিও বহু আক্রমণের সম্মুখীন হন। ১৯৭৫ সালে ইউনিয়ন গড়ে ওঠার পর তাঁর বাড়িতে এক কর্মীসভার উপর জনতা পার্টি আশ্রিত একদল গুণ্ডা আক্রমণ চালালে কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য সহ বহু কর্মী গুরুতর আহত হন। সেসময় প্রবল সন্ত্রাসের পরিবেশের মধ্যে থেকেও যে কমরেডরা ইউনিয়নকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন, কমরেড গ্যাব্রিয়েল তাঁদের অন্যতম। বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও কেমন করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যেতে হয় তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। দলের প্রতি তাঁর প্রশ্নাতীত আনুগত্যের জন্য পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে তিনি পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। ইউনিয়নের তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় বডির সদস্য এবং কোষাধ্যক্ষ।

২০০২ সালের আগস্ট মাস থেকে মালিকপক্ষের চক্রান্তে রামঝোড়া চা-বাগান বন্ধ। অন্য শ্রমিকদের সাথে কমরেড লালের পরিবারেও নেমে এসেছিল অনাহারের জ্বালা। বহু শ্রমিকের মৃত্যু তিনি দেখেছেন। কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত ইউনিয়নের প্রতি তাঁর ভালবাসায় এতটুকু ঘাটতি দেখা যায়নি।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই চা-শ্রমিকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। দলে দলে মানুষ তাঁকে শেষ দেখা দেখতে ছুটে আসেন।

কমরেড গ্যাব্রিয়েল লাল সেলাম

২৩ জানুয়ারি ফালাকাটায়

মদ বিরোধী দিবস পালন করল ডি ওয়াই ও

রাজ্যের অন্যান্য অসংখ্য স্থানের মতো সারা ভারত ডি ওয়াই ও জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ইউনিটের উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্ম দিবসকে মদ বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করা হয়। নতুন চৌপথিতে সুসজ্জিত মঞ্চে নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে বিশিষ্ট শিক্ষক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন — রাজ্য সরকার যে ঢালাও মদের লাইসেন্স দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আজকের এই স্মরণীয় দিনটিকে ডি ওয়াই ও মদবিরোধী দিবস হিসাবে পালন করছে। ডি ওয়াই ও'র এই উদ্যোগকে শুভ প্রচেষ্টা বলে তিনি অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, সি পি এম দল যথার্থ মার্কসবাদী নয় বলেই এ ধরনের ঘৃণ্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে ডি ওয়াই ও'র ফালাকাটা শাখা সম্পাদক দেবু সাহা শপথবাক্য পাঠ করেন। সভাপতি অমল সাহা ও এস ইউ সি আই লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড পীযূষকান্তি শর্মা ও সুদর্শন আইচ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শেষে

নেতাজির প্রতিকৃতি নিয়ে একটি সাইকেল মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

কলকাতা

কলকাতার পশ্চিম বেহালায় 'অন্বেষা' সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ২৩ জানুয়ারি নেতাজির প্রতিকৃতি ও উদ্ধৃতি ব্যানার নিয়ে প্রভাতফেরী, সাংস্কৃতিক ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। নেতাজির আদর্শ ও সংগ্রাম তুলে ধরে আলোচনা করেন সংস্থার সভাপতি বিকাশ ভট্টাচার্য ও স্বপন পালিত, সজল বোস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে একটি নাটকও পরিবেশিত হয়।

দক্ষিণ শহরতলি রিক্সা-ভ্যানচালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১০টি রিক্সা স্ট্যাণ্ডে নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে নেতাজি দিবস পালন করেন রিক্সা ও ভ্যানচালকরা।

পূর্বমেদিনীপুর

গ্রামপঞ্চায়েতগুলিতে গণবিক্ষোভ চলছে

গরু, ছাগল, মুরগি, সাইকেল, রিক্সা, ফুলবাগান, পানবরোজ প্রভৃতির উপর পঞ্চায়েতের কর চাপানোর প্রতিবাদে, যথাযথ বি পি এল তালিকা তৈরি ও সকলের জন্য রেশন কার্ডের দাবি সহ এলাকার উন্নয়নের দাবিতে পূর্বমেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার মাতঙ্গিনী ব্লকের অন্তর্গত শান্তিপুর ২ গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানের কাছে সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের বুড়ারী শাখার পক্ষ থেকে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের আগে তিন শতাধিক মানুষের বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য সন্তোষ সী, রতন মাইতি, অনন্ত দাস, সুবল সামন্ত, হরিপদ ভৌমিক, বলরাম প্রামাণিক, সনাতন সামন্ত, দুর্যোধন দাঁ, মুরারি মাইতি প্রমুখ। কে কে এম এস-এর দীর্ঘদিনের দাবি — মির্জাপুর খালের উপর বুড়ারীতে স্লুইস গেট নির্মাণ করা। এই কাজে ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে পঞ্চায়েত প্রধান জানান।

তমলুক থানার অন্তর্গত ধলহরা গ্রামপঞ্চায়েতে ১৯ জানুয়ারি, পিপুলবেড়্যা-২ গ্রামপঞ্চায়েতে ২২ জানুয়ারি কর চাপানোর প্রতিবাদে কে কে এম এস-এর পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পাঁশকুড়া থানার কোলাঘাট-১ ও অমলহাস্তা গ্রামপঞ্চায়েতে ১৯ ও ২০ জানুয়ারি গণডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। গরিব মানুষের উপর পঞ্চায়েতের এই কর চাপানোর সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মানুষের মধ্যে যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, পঞ্চায়েতগুলিতে গণডেপুটেশনে শত শত নারীপুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তা প্রমাণ করছে। জনমতকে উপেক্ষা করে যদি এই কর চাপানো হয় তাহলে প্রবল গণবিক্ষোভের মুখে সরকারকে কোণঠাসা হতে হবে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রসংঘ

ওয়াকিবহাল সমস্ত মানুষই জানেন, আপাত ঘোষিত লক্ষ্য যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদীদের সৃষ্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রকে এবং বিশেষভাবে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েট ইউনিয়নকে উচ্ছেদ করা। কিন্তু তা তো হয়ইনি বরং ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিটলার তোষণ সত্ত্বেও সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজের হাতে ফ্যাসিবাদী সামরিক শক্তির পরাজয় ঘটেছিল। স্ট্যালিন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে মানবসভ্যতার রক্ষাকর্তা বলে সেলাম জানিয়েছিল কমিউনিস্ট, অকমিউনিস্ট, গণতন্ত্রী, মানবতাবাদী — এক কথায় গোটা দুনিয়া। সাম্রাজ্যবাদীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল এবং চীন সহ পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং একটি সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে উঠেছিল।

মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সাধারণভাবে নাৎসি-ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তির (ইতালি-জার্মান-জাপান জোট) বিরুদ্ধে এই জয়ে এবং বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশের জনসাধারণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের তখন প্রবল জোয়ার। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের আকর্ষণ তখন দ্রুত বাড়ছে। শুধু ঔপনিবেশিক দেশের জনসাধারণের মধ্যেই নয়, এমনকি দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলোর শাসকরাও তাদের দেশকে সাম্রাজ্যবাদী থাবার হাত থেকে রক্ষার গ্যারান্টি হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নকেই ভরসা করতে শুরু করেছিল।

একথা সকলেই জানেন যে, গত বিশ্বযুদ্ধের কোন তাপই আমেরিকার গায়ে লাগেনি। বরং চরম সুবিধাবাদী হিসাবে যুদ্ধের আবর্তের বাইরে থেকে যুদ্ধাস্ত্র ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের ব্যবসা করে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি শক্তিশালী হয়েছিল। সাথে সাথে যুদ্ধের রীতিনীতি এবং মানবতাকে পদদলিত করে সামরিক দম্ভ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন শাসকরা যুদ্ধের অন্তিম পর্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও পরাজিত জাপানের দুটি শহরের জনগণের উপর পারমাণবিক বোমা ফেলে নারী-শিশু-বৃদ্ধ সহ লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোককে হত্যা করেছিল, পঙ্গু করেছিল, মানবসভ্যতার ইতিহাসে যা এক বর্বরতার অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আভ্যন্তরীণ অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে-ওঠা লীগ অব নেশনসের অবলুপ্তি ঘটেছে — এই অবস্থায় বিভিন্ন দেশকে সোভিয়েট প্রভাবমুক্ত রেখে মূলত সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি রুখতে এবং সর্বোপরি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীদের কাছে একটি বিশ্বসংগঠন গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়ে। ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে জন্ম নিল ইউ এন ও বা রাষ্ট্রসংঘ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যে এরকম একটি সংগঠনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তার প্রমাণ, রাষ্ট্রসংঘ গঠনের সিদ্ধান্তের সাথে সাথেই ঐ দেশের শিল্পপতি, বিপুল বৈভবের মালিক, জুনিয়র রকফেলার রাষ্ট্রসংঘের জমি কেনার জন্য ৮৫ লক্ষ ডলার (যার বর্তমান মূল্য কয়েক হাজার কোটি ডলার) দান করেছিল। ঠিক এইসময়, সাম্রাজ্যবাদীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে যুদ্ধে পরিণত হতে না দেওয়া এবং বিশ্বের উপর ব্রিটিশ আধিপত্যকে খর্ব করে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মার্কিন প্রভাবাধীন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক নামে দুটি ঋণদানকারী সংস্থাও গড়ে তোলা হয়। বস্তুত এদের হাতিয়ার করেই পরমাণু বোমার অধিকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক বৃহৎ শক্তি হিসাবে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে উঠে এসেছিল। শুরু হল তার দস্যুবৃত্তি, পররাজ্য আক্রমণ, পরদেশ দখল, অন্যদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হরণের নিত্যকার তাণ্ডব, আর এই তাণ্ডবকে আইনসঙ্গত ও যৌক্তিক রূপ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘকে ন্যক্কারজনকভাবে ব্যবহার করা শুরু হল।

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম যে হীন স্বার্থটিকে চরিতার্থ করতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রসংঘকে ব্যবহার করেছিল তাহল ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টিনীয় আরবদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করা ও তাদের ভূখণ্ড থেকে ৫৫ শতাংশ কেটে নিয়ে ইহুদীবাদী (জিওনিষ্ট) রাষ্ট্র ইস্রায়েলের পত্তন করা। রাষ্ট্রসংঘের ইতিহাসে প্রথম 'ইউনাইটেড নেশনস স্পেশাল কমিটি অন প্যালেস্টাইন' গঠন করে সাম্রাজ্যবাদীরা এই চক্রান্ত হাসিল করেছিল। এই চক্রান্তে কোন বাধা যাতে না আসে, সেজন্য ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এই কমিটিতে কোন আরব দেশকে ঢুকতে দেয়নি। এবং স্রেফ সংখ্যাধিক্য ও অর্থের জোরে তারা শুধু এই সিদ্ধান্তকেই মানিয়ে নেয়নি, এমনকি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদকে দিয়ে এই কমিটিকেও আইনসম্মত বলে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিল। এর ফলে সাড়ে সাত লক্ষ প্যালেস্টিনীয় আরব নিরাশ্রয় হয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক যে সময় পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলোর জনগণ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে লিপ্ত, ঠিক তখনই রাষ্ট্রসংঘ সাম্রাজ্যবাদীদের পুতুল হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পরাধীনতার এই শৃঙ্খল পরাতে সাহায্য করে।

ঠিক একই ধরনের জিনিস ঘটেছিল কোরিয়ার ক্ষেত্রেও। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার যে চক্রান্ত শুরু করেছিল, তাতেও রাষ্ট্রসংঘকে তারা ব্যবহার করে। বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই কোরিয়ার দক্ষিণ অংশের প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলো বিভিন্ন জাতীয় স্বাধীনতা প্রস্তুতি কমিটির মধ্যে সংগঠিত হয়ে কোরিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভূখণ্ডের মিলনে উদ্যোগী হয়েছিল। এই ঐক্য প্রচেষ্টায় কোরিয়ার মানুষ উৎসাহিত হলে কী হবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক কোরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বিঘ্ন ঘটাতে পারে — এই আশঙ্কায় শুরু হল দক্ষিণ কোরিয়াকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন রাখার ষড়যন্ত্র। এই উদ্দেশ্যে সমন্বয়কারী কমিটিগুলোকে নির্মম অত্যাচারে ধ্বংস করে একটা জাল নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানে মার্কিন শাসকরা পুতুল সরকার বসিয়ে দিয়েছিল। প্যালেস্টাইনের ধাঁচে এক্ষেত্রেও মার্কিন শাসকরা রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব নিয়ে এসে ইউনাইটেড নেশনস্ টেম্পোরারি কমিশন অন কোরিয়া গঠন করেছিল। গঠনের সাথে সাথেই এই কমিশনকে দিয়ে মার্কিন শাসকরা সিওলের পুতুল সরকারকে কোরিয়ার একমাত্র আইনসম্মত সরকার বলে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করল। এইভাবে রাষ্ট্রসংঘ আবার মার্কিন চক্রান্তের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হল।

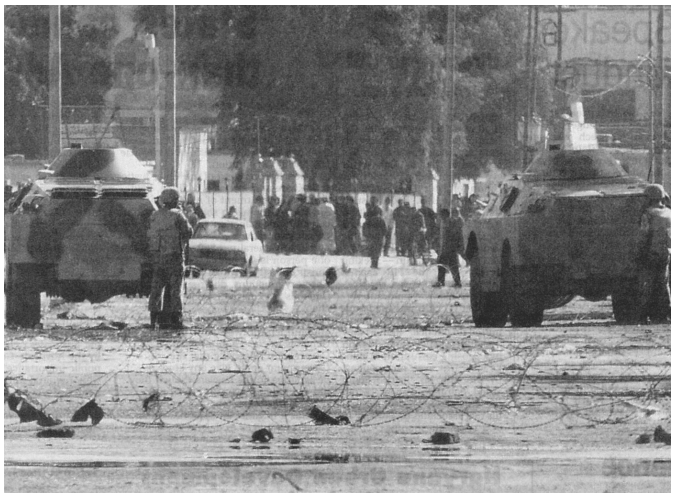

গত ১৩ জানুয়ারি ইরাকের আল কু-তে চাকরির দাবিতে বেকার ইরাকি তরুণদের বিক্ষোভ এভাবেই ট্যাঙ্ক দিয়ে মোকাবিলা করছে মার্কিন দখলদার বাহিনী। (ছবি ঃ হিন্দুস্তান টাইমস্, ১৪-১-০৪)

তারপর এল ১৯৫০ সাল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ কোরিয়ার তাঁবেদার সরকারের সাথে যোগসাজসে সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়া আক্রমণে অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রসংঘে গেল এবং তাদের এই আক্রমণে সম্মতি দিতে রাষ্ট্রসংঘকে বাধ্য করল। এই আগ্রাসনে মার্কিন দস্যুরা নারী শিশুসহ প্রায় ৫০ লক্ষ কোরীয়কে খুন করেছিল। এমন ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল যে সেখানে একটি বাড়িও আস্ত ছিলনা। শেষপর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক চীনের দৃপ্ত ভূমিকা ও কোরীয় জনগণের প্রবল বাধায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে হার স্বীকার করে পিছু হঠতে হয়।

ঔপনিবেশিকতাবিরোধী উত্তাল আন্দোলনের চাপে বেলজিয়ান ঔপনিবেশিকরা ১৯৬০ সালে আফ্রিকার কঙ্গোকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা জাতীয়তাবাদী নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বার স্বাধীন কঙ্গো সরকারের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাল, এবং খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ কাতাঙ্গাকে কঙ্গো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। ঘটনাটা নিরাপত্তা পরিষদে উঠল। লুমুম্বা আশা করেছিলেন রাষ্ট্রসংঘ তাঁকে সাহায্য করবে। রাষ্ট্রসংঘ কঙ্গোয় নিরাপত্তাবাহিনী পাঠালো বটে, কিন্তু তারা বেলজিয়ান হানাদারদের না রুখে বরং সেই হানাদারদেরই সাহায্য করল কঙ্গো সরকারের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, লুমুম্বার আবেদনে সাড়া দিয়ে যখন সোভিয়েট নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির সাহায্য পাঠিয়েছিল, আমেরিকার প্ররোচনায় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী সেই জাহাজ আটকে দিয়েছিল। ততদিনে কমরেড স্ট্যালিনের জীবনাবসান হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্ব সংশোধনবাদীরা কবজা করায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠতায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এরই সুযোগ নিয়ে বেপরোয়া মার্কিন শাসকরা সি আই এ'র সাহায্যে লুমুম্বাকে বন্দী করে নৃশংসভাবে খুন করে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই মদত দিয়ে স্বৈরাচারী সামরিক প্রধান মবুতুকে ক্ষমতায় বসায়। এইভাবেই এই সাম্রাজ্যবাদীরা বারবার রাষ্ট্রসংঘকে নগ্নভাবে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

এখানেই শেষ নয়। যে রাষ্ট্রসংঘে স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া সদস্য হতে পারে না, সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উপনিবেশ মালয়েশিয়াকে জোর করে সদস্য হিসাবে ঢুকিয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসংঘ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং আমেরিকার সাহায্যের কোন তোয়াক্কা না করেই ঘোষণা করেছিল "The US can go to hell with its aid !" "খয়রাতির ঝুলি নিয়ে আমেরিকা জাহান্নমে যাক।" ঠিক এই সময়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত নির্দেশকে দু'পায়ে মাড়িয়ে ভিয়েতনামে নিষিদ্ধ নাপাম বোমা সহ গণবিধ্বংসী নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালাচ্ছিল। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকায় তখন প্রবল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের জোয়ার। এই প্রেক্ষাপটে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান সুকর্ণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আলাদা একটা রাষ্ট্রসংঘ গঠনের আহ্বান জানান। ভীত আমেরিকা সি আই এ'র সাহায্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সুকর্ণকে ক্ষমতাচ্যুত করে, সামরিক জুন্টার নেতা সুহার্তোকে ইন্দোনেশিয়া সরকারে বসিয়ে ৬০ লক্ষ কমিউনিস্ট ও বামপন্থী কর্মী-সমর্থককে হত্যা করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ড দুনিয়ার সবাই জানে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ ছিল নির্বিকার, নিরাসক্ত। মূলত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই নিকৃষ্ট কার্যকলাপকে রাষ্ট্রসংঘ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছিল।

এভাবে জন্মলগ্ন থেকেই মার্কিন শাসকদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রসংঘকে তাদের হীনস্বার্থে ব্যবহার করেছে, বা যেখানে ব্যবহার করতে পারেনি তাকে ভেটো দিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে বা তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজের পশুশক্তি দিয়ে দেশে দেশে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। ইসরায়েলের আরব ভূমি দখল এবং

ছয়ের পাতায় দেখুন

আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ

আমেরিকায় তিনমাসব্যাপী ধর্মঘট চলছে

ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, ন্যূনতম মজুরি, স্বাস্থ্যবীমার সুযোগ সহ মোট ১৬ দফা দাবি আদায়ের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের বিভাগীয় বিপণি এবং দোকানের ৭০ হাজার কর্মচারী ১৭ নভেম্বর থেকে ধর্মঘটে নেমেছে। ধর্মঘট ভাঙার জন্য মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডা এবং পুলিশের লাঠি, ব্যাটনের আঘাতে শতাধিক শ্রমিক হতাহত হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সংগ্রামের প্রতি সহৃদয়তা জানানোর জন্য AFL-CIO সহ আমেরিকার বিভিন্ন শিল্পের বৃহৎ শ্রমিক সংগঠনগুলি ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে আমেরিকা জুড়ে শিল্প ধর্মঘট পালন করেছে। আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলির মতে এ ধর্মঘট হচ্ছে সাম্প্রতিককালের ধর্মঘটগুলির মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং ইতিমধ্যে এ ধর্মঘট তিন মাসে পদার্পণ করতে চলেছে। (ওয়ার্কার্স ভ্যানগার্ড [শিকাগো] ২৪-১-০৪)

স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হ্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নগুলির সংগ্রামী মঞ্চ

১ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীদের বৃহত্তম সংগঠন সার্ভিস এমপ্লয়িজ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন (সংক্ষেপে SEIU) এবং ক্যালিফোর্নিয়া নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন (সংক্ষেপে CNA) এক যুক্ত কনভেনশনে উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হ্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য একটি সংগ্রামী মঞ্চ গড়ে তুলেছে। প্রসঙ্গত বিগত দু'বছর যাবত ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য প্রশাসন স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হ্রাস করায় সুলভ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ থেকে এ রাজ্যের দু'লক্ষ গরিব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। যাতে রাজ্য বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে আরও বরাদ্দ হ্রাস সরকার না করতে পারে তার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নগুলি নিজেদের মধ্যে জোট বেঁধেছে। এ জোট গঠনের ঘটনাকে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সমস্ত স্তরের খেটেখাওয়া মানুষ একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছে।

(ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড [নিউ ইয়র্ক] ১৫-১-০৪)

ফিলিপাইনের স্বাস্থ্য কর্মীরা হাসপাতাল বেসরকারীকরণ রুখে দিল

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা শহরতলিতে অবস্থিত ন্যাশনাল সেন্টার ফর মেন্টাল হেল্‌থ (NCMH) সে দেশের সরকার পরিচালিত একটি বৃহৎ মানসিক হাসপাতাল। গত ডিসেম্বর মাসে এ হাসপাতালটি তার ৭৫ বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন করেছে। দেশের এই বহু প্রাচীন হাসপাতালটিতে ৪ হাজার মানসিক রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং প্রতিদিন এ হাসপাতালের বহির্বিভাগে হাজির থাকে ৫০০ রোগী। এখানে গরিব মানুষের নামমাত্র মূল্যে চিকিৎসা করা হত। অর্থাভাবের কারণ দেখিয়ে সরকার বছর দুয়েক আগে হাসপাতালে চার্জ বাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্কটে পড়েছে স্বল্প রোজগেরে মানুষ এবং সস্তা মজুরির শ্রমিকরা। সরকার এ হাসপাতালটিকে বেসরকারীকরণ করার জন্য ইদানীং খুব উঠে পড়ে লাগে। সরকারের এ চক্রান্তকে রোখার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের সংগঠন অ্যালায়েন্স অফ হেলথ্‌ ওয়ার্কার্স (AHW), স্থানীয় জনসাধারণ এবং বিভিন্ন সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে নামে। দীর্ঘ তিন মাস ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসার পরে সম্প্রতি সরকার পিছু হটেছে এবং আপাতত এই মানসিক হাসপাতালটি বেসরকারীকরণের থাবা থেকে রেহাই পেয়েছে। (ঐ)

আন্দোলনের চাপে সিওল থেকে মার্কিন সেনা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে

নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সেনাঘাঁটির কর্তৃপক্ষ ৭ হাজার মার্কিন সেনাকে রাজধানী শহর সিওলে মোতায়েন রেখেছিল। ১৯৮২ সালে সিওল অলিম্পিকের সময় এই ৭ হাজার সেনাকে সিওলে মোতায়েন করা হয়েছিল আইন-শৃঙ্খলা তদারকি করার কাজে। অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পরেও কিন্তু মোতায়েন ৭ হাজার সেনাকে সিওল থেকে সরানো হয়নি। উপরন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে, রায়ট পুলিশের পাশাপাশি এই সেনাদেরকেও দেশের শ্রমিক আন্দোলন কিংবা সরকারবিরোধী আন্দোলন দমন করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। শেষপর্যন্ত আন্দোলনের চাপে মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, ২০০৬ সালের মধ্যে তারা তিন কিস্তিতে এই ৭ হাজার সেনাকে সিওল শহর থেকে ১২০ মাইল দূরে উত্তরের পিয়ংইজ্যাক শহরে সরিয়ে নেবে। (হিন্দুস্থান টাইমস ১৮-১-০৪)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রসংঘ

পাঁচের পাতার পর

মধ্যপ্রাচ্যে হানাদারির বিরুদ্ধে ১৪৩নং প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে পাশ হয়েছে; একবার নয় একাধিকবার ইসরায়েল বিরোধী প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে ভোটাধিক্যে পাশ হলেও মার্কিন শাসকরা প্রত্যেকবার ভেটো দিয়ে তা উড়িয়ে দিয়েছে। পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণপশ্চিম এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ ও আফ্রিকায় এমন বহু ঘটনা অসংখ্যবার ঘটেছে।

ইসরায়েল অন্য স্বাধীন দেশে নগ্নভাবে বর্বর হানাদারি চালালেও, তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে কোনও প্রস্তাব তুলতে দেয়নি আমেরিকা। রাষ্ট্রসংঘকে ব্যবহার করেই আমেরিকা স্বাধীন ইরাকের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়েছিল, ইরাকের সামরিক প্রতিরক্ষার সকল সম্বলকে ধ্বংস করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের নামে দফায় দফায় অস্ত্রপরীক্ষক দল পাঠিয়েছে আমেরিকা, তাতে রাষ্ট্রসংঘের তকমা এঁটে মার্কিন গুপ্তচররা কাজ করেছে। পরে যখন সরাসরি ইরাক আক্রমণের মার্কিন প্রস্তাবে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বেঁকে বসল এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আক্রমণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, তখন কিন্তু আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘের কোনও তোয়াক্কা করেনি। ইরাকে আক্রমণ চালিয়ে একটি স্বাধীন দেশকে উপনিবেশে পরিণত করেছে তারা। সর্বশেষ এই ঘটনা প্রমাণ করল যে, রাষ্ট্রসংঘকে আমেরিকা পায়ের জুতো বলেই গণ্য করে, যা সুবিধামতো সে পায়ে গলায় ও ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফলে, যারা মনে করেন, দেশে দেশে বিরোধ মেটানোয়, যুদ্ধ পরিস্থিতির সমাধানে রাষ্ট্রসংঘ একটি নিরপেক্ষ বিশ্বসংগঠন হিসাবে কাজ করবে, তাদের এই চিন্তা আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

ইরাক ডায়েরি

২৩ জানুয়ারি ঃ বাগদাদের ১২৫ মাইল উত্তরে সামারাতে এক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে নিকটবর্তী এক মার্কিন সেনা চৌকির পাহারাদার দু'জন মার্কিন সেনা মারা গেছে।

ফালুজাতে রাস্তার ধারে রাখা বোমা বিস্ফোরণে মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি হামভি ট্রাক উল্টে গেলে ড্রাইভার সহ তিন মার্কিন সেনা নিহত এবং সাত সেনা আহত হয়েছে।

একটি 'OH-58 Kiowa Warrior' শ্রেণীর মার্কিন সেনা হেলিকপ্টার উত্তরের মোসুল শহরের কাছে টাইগ্রিস নদীতে ভেঙে পড়েছে। নদীতে নজরদারি কাজে রত একটি মার্কিন পেট্রোল বোটের উপর পড়ে হেলিকপ্টারটি, বোটটি ডুবে যায়। পেট্রোল বোটের আরোহী দু'জন মার্কিন সেনা নিহত এবং চারজন আহত হয়েছে। ভেঙে পড়া হেলিকপ্টারের পাইলট ও তিনজন কর্মীও মারা গেছে। (হিন্দু, রয়টার্স, ২৪-১-০৪)

২৪ জানুয়ারি ঃ সামারা শহরে স্থানীয় আদালতের সামনে দাঁড়ানো একটি টয়োটা গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটালে তিনজন নিহত এবং আটত্রিশ জন গুরুতরভাবে আহত হয় (এ পি, ডেকান হেরাল্ড, ২৫-১-০৪)।

২৫ জানুয়ারি ঃ মধ্য ইরাকের বাইলি শহরে একটি মার্কিন সেনা চৌকিতে গেরিলারা গ্রেনেড ছুঁড়লে ১ জন মার্কিন সেনা নিহত এবং ৮ জন গুরুতরভাবে আহতে হয়েছে। (পি টি আই, রয়টার্স, ২৬-১-০৪)

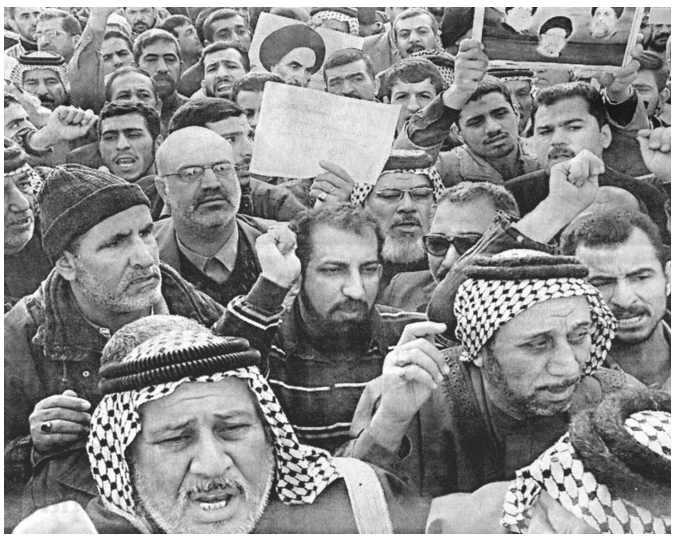

অবিলম্বে নির্বাচনের দাবিতে বাগদাদে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ

বাগদাদের উত্তর ও পশ্চিমের দু'টি স্থানে তিনটি বোমা বিস্ফোরণে ৫ জন মার্কিন সেনা ও তিনজন ইরাকি নাগরিক মারা গেছে। (হিন্দু, রয়টার্স, ২৬-১-০৪)

২৬ জানুয়ারি ঃ বাগদাদ শহরের উপকণ্ঠে দখলদার মার্কিন বাহিনীর সদর দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের আবাসস্থলে ইরাকি গেরিলারা গভীর রাতে রকেট ও গ্রেনেড নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। মার্কিন সেনারা উপস্থিত হবার আগেই গেরিলারা গা ঢাকা দেয়। (হিন্দু, ২৮-১-০৪)

২৭ জানুয়ারি ঃ ফালুজা ও রামাদি শহরের মধ্যবর্তী খালদিয়া শহরে এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে তিনজন মার্কিন সেনা মারা গেছে। ঘটনার পরই মার্কিন সেনারা গোটা অঞ্চল সিল করে দেয় এবং বাড়ি বাড়ি হামলা চালিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে শিশু ও বৃদ্ধ সহ ১ হাজার জনকে ধরে আনে। (ঐ)

বাগদাদের দক্ষিণে কারবালা শহরে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ৬ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। (রয়টার্স, ২৮-১-০৪)

২৮ জানুয়ারি ঃ মধ্য বাগদাদের কারাদা অঞ্চলে সাহিল হোটেলের সামনে এক শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে হোটেলের সামনে দাঁড় করানো ১০টি গাড়ি একেবারে চূর্ণ হয়ে যায়। এসব গাড়ির মধ্যে কয়েকটা সেনা জীপও ছিল। এই হোটেলের অনেক আবাসিকের মধ্যে একজন হচ্ছেন মার্কিন মদতপুষ্ট ইরাকি প্রশাসনিক অথরিটির শ্রমমন্ত্রী সামিইঝারা আল মাজুন, অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। (এ পি, দি স্টেটসম্যান ২৯-১-০৪)

উল্লেখ্য যে, 'ইরাকে যুদ্ধ শেষ হয়েছে' — গত ১ মে প্রেসিডেন্ট বুশের এই ঘোষণার পর থেকে অদ্যাবধি (২৭-১-০৪) ইরাকি গেরিলাদের হাতে ৫২৩ জন মার্কিন সেনা নিহত, ১১ হাজার সেনা আহত এবং ১২৪ জন জোট সেনা হতাহত হয়েছে। অক্টোবর ২০০৩ থেকে ২৬-১-০৪ তারিখের মধ্যে গেরিলারা ১২টি সেনা হেলিকপ্টার এবং একটি সি-৩৫ পরিবহন বিমানকে গুলি করে নামিয়েছে। (এ পি, রয়টার্স, ডেকান হেরাল্ড ২৮-১-০৪)

বর্ধমানের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনে সফল ডি এস ও রাজ্য সম্মেলন

ছাত্ররা শপথ নিল দুর্বার আন্দোলনের

২২ জানুয়ারি বর্ধমান শহরে ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর দৃপ্তকণ্ঠে ধ্বনিত হল — এ আই ডি এস ও জিন্দাবাদ। শহরের সার্কাস ময়দানে এদিন ছিল ডি এস ও'র সপ্তম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন। ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি অধিবেশন।

২২ জানুয়ারি বেলা ১২টার কিছু পরেই শুরু হয় ছাত্রছাত্রীদের বিশাল মিছিল। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে এসে তারা মিলিত হয়েছে বর্ধমান শহরে। দৃপ্তকণ্ঠে স্লোগান উঠেছে, 'শিক্ষার বেসরকারীকরণ রুখছি, রুখব', 'শিক্ষায় ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে দিকে দিকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলুন।' ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর এই প্রকাশ্য সমাবেশ আয়োজনের পর্ব মসৃণ হয়নি। সি পি এমের কর্মী-সমর্থকদের একাংশ, যারা জেলাকে তাদের খাস তালুক মনে করে, তারা নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে — কোথাও ডি ওয়াই এফ-এর নামে, কোথাও এস এফ আই-এর নামে। ডি এস ও'র দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়া হয়েছে। স্কুল-কলেজের দরজায় দাঁড়িয়ে ছাত্রদের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে বাধা দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে স্কুলের ছাত্রদের।

সম্মেলনে আগত ছাত্র প্রতিনিধিদের থাকার জন্য কোন স্কুলবাড়ি পাওয়া যায়নি। শেষপর্যন্ত অনেক বেশি ব্যয়ভার মাথায় নিয়ে কয়েকটি অনুষ্ঠান-বাড়ি ভাড়া করতে হয়েছে, যেগুলির মধ্যে আবার কয়েকটি ছিল প্রতিনিধি সম্মেলন স্থল থেকে বেশ দূরে। ফলে যাতায়াত হয়েছে সময়সাপেক্ষ। এই বাড়তি খরচ সংগঠকদের অর্থ সঙ্কটে ফেলে দেয়। এজন্য রাস্তায়-বাজারে-স্টেশনে-ঘরে ঘরে একটানা চাঁদা সংগ্রহ অভিযান চলেছে। বর্ধমানের জনগণ অকৃপণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অর্থ ছাড়াও প্রতিনিধিদের খাওয়ার জন্য বর্ধমান ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির হাটেবাজারে চাল-সবজি-ডাল সংগ্রহ করা হয়েছে, মানুষ খুশি মনে তা দিয়েছেন। ছাত্র প্রতিনিধিদের নিজস্ব যতটুকু টাকা-পয়সা সাথে ছিল, সবই তারা সম্মেলন তহবিলে দান করেছে। এভাবেই পরিশ্রম ও সাহসের সাথে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছে ডি এস ও'র তরুণ কর্মী-সদস্যরা। সঙ্গে ছিল শহরবাসী গরিব ও মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন।

সম্মেলন উপলক্ষে বর্ধমান শহরকে সাজিয়ে ছিল ডি এস ও কর্মীরা। এস এফ আই-এর রুচিহীন কার্যকলাপে তার অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে; তা সত্ত্বেও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুধারে চোখে পড়ে কিছু পোস্টার, দেওয়াল লিখন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি তোরণ। মিছিল বের হয় স্টেশন চত্বর থেকে। সেখান থেকে বেরিয়ে জি টি রোড ধরে সুসজ্জিত মিছিল যায় প্রকাশ্য অধিবেশন স্থল 'সার্কাস ময়দান'-এর দিকে। শহরের মানুষ সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে ছাত্রদের মিছিল দেখেছেন। পথের দু'ধারের অফিস, ব্যাঙ্ক, দোকান থেকে নেমে এসে মিছিল দেখেছেন মানুষ। এক পথচারী বললেন, সি পি এমের এই 'দুর্গে' ডি এস ও এত বড় একটা রাজ্য সম্মেলন করতে যাচ্ছে, সেটাই অবাক হওয়ার মতো ঘটনা। বললেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান শহরে আছি, 'ইয়ং ব্লাড'-এর এত বড় মিছিল এ শহর আগে কখনো দেখেনি। ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে এক ভ্যান-রিক্সা চালক রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছিলেন। বললেন — এরা যা বলছে, শুনে খুব ভালো লাগছে।

বেলা দেড়টা নাগাদ মিছিল পৌঁছায় সার্কাস ময়দানে। ময়দানের এক প্রান্তের সুসজ্জিত মঞ্চটি দূর থেকে চোখে পড়ে। মঞ্চে লাল পতাকার কাট-আউট নীল আকাশের পটভূমিতে জ্বলজ্বল করছে। এ আই ডি এস ও'র ৫০তম বর্ষ স্মরণে মঞ্চের দু'পাশে হাওয়ায় দুলছে ৫০টি রক্তপতাকা।

সার্কাস ময়দানে প্রবেশপথের বাঁদিকে আয়োজিত হয়েছে চিত্রপ্রদর্শনী। রয়েছে মর্মস্পর্শী সব ফটোগ্রাফ। বিক্ষোভ আন্দোলনে পুলিশ ও সি পি এমের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর আক্রমণে কীভাবে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ডি এস ও কর্মীরা, কীভাবে পুলিশ ছাত্রী কর্মীদের শালীনতা হরণের অপচেষ্টা করেছে, কীভাবে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে কিশোর মাধাই হালদার — সেইসব মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে প্রদর্শনীতে। প্রবেশপথের অন্য দিকে সাজানো রয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নানা উদ্ধৃতি। এ আই ডি এস ও'র কর্মী-সমর্থকরা ভিড় করে প্রদর্শনী দেখছে, মঞ্চে তখন তরুণ কণ্ঠে শুরু হয়েছে উদাত্ত সঙ্গীত — 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে....'

ঠিক ২টোয় শুরু হয় প্রকাশ্য অধিবেশনের সভা। মঞ্চে তখন উপস্থিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে, এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় উপদেষ্টা, এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রভাস ঘোষ, এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান, রাজ্য সভাপতি কমরেড দেবাশিষ রায় এবং এ আই ডি এস ও'র অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার সভাপতি অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে'র উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েই শুরু হয় এ আই ডি এস ও'র ৭ম রাজ্য সম্মেলন। সার্কাস ময়দান তখন কানায় কানায় পূর্ণ, যদিও এ সমাবেশে হাজির হওয়া সহজ হয়নি। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাস ভর্তি করে ছাত্রছাত্রীরা যখন সম্মেলনের জন্য রওনা হয়, তখন এস এফ আই-এর কিছু উগ্র সমর্থক বাস থেকে নামিয়ে তাদের মারধোর করে। তা সত্ত্বেও রোখা যায়নি ছাত্রছাত্রীদের অদম্য উৎসাহকে। ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর নজর এড়িয়ে অন্য বাসে চড়ে দলে দলে তারা হাজির হয়েছে সার্কাস ময়দানে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রবল আগ্রহে জড়ো হয়েছেন শহরের সাধারণ মানুষও, মাঠের বাইরে রাস্তায় তখন ভিড়।

উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন যে, এ রাজ্যে ধনী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য স্পষ্টতই দু'ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে, অথচ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, এ কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি। শিক্ষা আন্দোলনে এ আই ডি এস ও কর্মীদের লড়াই ও তাদের পরিশীলিত ব্যবহারের প্রশংসা করে তিনি ছাত্রদের মানুষ হয়ে ওঠার জন্য আবেদন জানান।

এ আই ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই সম্মেলন সফল করার জন্য বর্ধমান জেলা ও শহরের শিক্ষক, অধ্যাপক সহ শ্রমজীবী যে সমস্ত সাধারণ মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানান। এস এফ আই-এর সন্ত্রাসের নিন্দা করে তিনি বলেন, ছাত্রসমাজ আজ এস এফ আই'কে ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে না; তারা জানে ছাত্রস্বার্থে লড়াই করছে একমাত্র এ আই ডি এস ও। তাই, এমনকী, এস এফ আই-এর নিচুতলার কর্মীরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ আই ডি এস ও'র আন্দোলনে সহযোগিতা করছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বলেন, এ আই ডি এস ও একটি অনন্যসাধারণ ছাত্র সংগঠন; চরিত্রগঠনের একটা সচেতন প্রয়াস গোড়া থেকেই এদের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ঘোষিত শিক্ষানীতির মধ্যে অমিলের চেয়ে যে মিলই বেশি এ মন্তব্য করে তিনি বলেন, এ রাজ্যে প্রাথমিকে ইংরাজি চালু করা নিয়ে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর স্বার্থে যে লড়াই এ আই ডি এস ও করেছে এবং তার প্রেক্ষিতে যে জনমত তৈরি হয়েছে, তাতে ইংরাজি চালু করা ছাড়া সরকারের আর উপায় ছিল না। এ আই ডি এস ও এরাজ্যে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে তারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে অন্যান্য যেসব রাজ্যে প্রাথমিকে ইংরাজি পড়ানো হত না, সেখানেও ইংরাজি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকার। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় স্তরে ছাত্রদের মধ্যে যে অসাধুতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, এ রাজ্যেও অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এখানে একটার পর একটা কলেজের ইউনিয়ন নির্বাচনে এস এফ আই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতছে, এটা মোটেই ভাল ঘটনা নয়। শিক্ষাকে পণ্য করা হলে, শিক্ষার্থীও পণ্যের অঙ্গ হয়ে যায়। এগুলো অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয়। উপস্থিত ডি এস ও কর্মী-সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা শৃঙ্খলাপরায়ণ, আপনাদের দেখে আমার ধারণা হয়েছে, শিক্ষার স্বার্থে, শিক্ষার্থীর স্বার্থে আন্দোলন আপনারা করতে পারবেন।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামল বলেন, সরকার তার নিজস্ব সংস্থা ইউ-জি-সি, এন-সি-ই-আর-টি ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক কঠিন আক্রমণ হানছে। ইউ-জি-সি'র ৫০তম বর্ষপূর্তিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও যে ভরতুকি দিয়ে যেতে হচ্ছে, তা অত্যন্ত দুঃখের। অথচ আপনারা বাজেটে, দেশের আর্থিক নীতিতে দেখেছেন, হাজার হাজার কোটি টাকার ভরতুকি এদেশের পুঁজিপতিদের দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই নীতির ফলেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ হারে ফি বেড়েছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে, গরিব মানুষ দূরের কথা, মধ্যবিত্তরাও সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছে না। পাঞ্জাবের মতো অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর রাজ্যেও কলেজের ভর্তি ফি জোগাড় করতে না পেরে একটি ছাত্র আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনার পর এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে পাঞ্জাবে জোরদার ছাত্র আন্দোলন হয়েছে — বর্ধিত ফি তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে সরকার।

শিক্ষায় এইভাবে ফি বৃদ্ধি হচ্ছে কেন? আসলে, এই মুমূর্ষু পুঁজিবাদের যুগে পুঁজিপতিদের ব্যবসা চলছে না, পণ্য বিক্রির বাজার নেই। তাই তারা শিক্ষাকে লাভজনক ব্যবসা হিসাবে নিচ্ছে। মরতে বসা পুঁজিবাদ শিক্ষাকে, স্বাস্থ্যকে বেচে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, শুধু শিক্ষার দাম বাড়ানো হচ্ছে তা নয়, শিক্ষার গুণগত মানের ওপরেও আঘাত নেমে আসছে। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ করা হচ্ছে। এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কমরেড সামল বলেন, একটি দেশ, একটি জাতি খেতে না পেলেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদি তার নৈতিকতা, মূল্যবোধ থাকে। সেজন্যই এদেশের শাসকবর্গ ছাত্র-যুবদের নৈতিকতার ওপর সবচেয়ে বেশি আঘাত হানছে। এর বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই করছে এ আই ডি এস ও। পশ্চিমবাংলাতে তো বটেই, উত্তরভারত ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, পূর্বে, পশ্চিমে সর্বত্র আজ এ আই ডি এস ও আন্দোলন সংগঠিত করছে। শ্লেষের সঙ্গে কমরেড সামল বলেন, এস এফ আই এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলি নিজেদের ছাত্রদরদী বলে! এরাই নাকি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে! সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য কাজের দাবিতে শ্লোগান দিতে এরা ক্লান্তিবোধ করে না। অথচ যখন আমাদের সংগঠন আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়, সর্বপ্রথমে বাধা দেয় এরাই। এ ঘটনা কেন ঘটছে? মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে আমরা বুঝি যে — এটাই ওদের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য!

এরপর বক্তব্য রাখেন প্রধান বক্তা এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় উপদেষ্টা এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি বলেন, সর্বাত্মক হতাশার অন্ধকারে সাধারণ মানুষ, ছাত্রযুব সম্প্রদায় যখন ছটফট করছে, তখন এই সম্মেলনের কাছে, সংগঠনের কাছে তাদের প্রত্যাশা অনেক। এই একটিমাত্র সংগঠন, বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায় যত কিছু অন্যায় অত্যাচার সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে, কোথাও মাথা নীচু করেনি। প্রাথমিকে ইংরাজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে এই সংগঠনের কর্মীরাই, আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পশ্চিমবাংলার এমন কোনও গ্রাম নেই, এমন কোনও স্কুল-কলেজ নেই, যেখানে যায়নি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। তারা মার খেয়েছে পুলিশ ও সি পি এম-এর সমাজবিরোধীদের হাতে। মার খেয়ে, রক্ত ঝরিয়ে, আন্দোলন করে শেষপর্যন্ত উদ্ধত মাথা নীচু করতে সি পি এম সরকারকে বাধ্য করেছে। এই সংগঠনের ডাকেই পশ্চিমবাংলার নানান জেলায় ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, ডোনেশন আদায়ের বিরুদ্ধে, সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজে ক্যাপিটেশন ফি'র বিরুদ্ধে লড়াই করে ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায় করেছে। এই সংগঠনের কর্মীরা উন্নত সংস্কৃতির ও নৈতিকতার ঝাণ্ডা বহন করছে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে। তাই, এই সংগঠনের নেতা-কর্মী সদস্যদের কাছে এদেশের জনগণের, ছাত্রসমাজের প্রত্যাশা অনেক। আপনাদের সম্মেলনের সাফল্য এই প্রত্যাশা পূরণের উপরই নির্ভর করবে।

তিনি বলেন, এদেশে নবজাগরণের ঘোষণা ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্লোগান ছিল — শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। ঘুম ভাঙিয়ে এই জাতিকে চেতনা দিতে হলে চাই ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিলেন এই স্বপ্ন নিয়েই — যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁদের স্বপ্ন সফল হবে। কিন্তু স্বাধীনতার পর আমরা দেখছি, প্রতিটি সরকারের একটাই নীতি — শিক্ষাকে খর্ব করো। এর জন্য ফি বাড়াও, ডোনেশন-ক্যাপিটেশন বসাও। কংগ্রেস, বিজেপি, সি পি এম সকলের

আটের পাতায় দেখুন

SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ৫৬ বর্ষ / ২৫ সংখ্যা ৮

ছাত্র সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

‘এম এল এ, এম পি নয়, আসল শক্তি জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, নৈতিক বল ও সংগঠন’

সাতের পাতার পর

একই নীতি। সর্বনাশ হবে জেনেই তারা এই নীতি নিয়েছে। কারণ, দেশে আজ কোটি কোটি বেকার, তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এ অবস্থায় অশিক্ষিত বেকারদের বোঝানো যায় অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে, কিন্তু শিক্ষিত বেকারদের বোঝানো যায় না। তাদের বিক্ষোভ বাড়বে। ফলে শিক্ষিতের সংখ্যা কমাও, শিক্ষার ব্যয় বাড়াও। ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত তারা নিচ্ছে। অন্য দিকে যতটুকু শিক্ষার সুযোগ রয়েছে, সেখানেও আক্রমণ হচ্ছে পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে। শাসকরা চায়না স্কুলে-কলেজে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হোক, বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসের চর্চা হোক। তারা বিজ্ঞানের চর্চা ততটুকু চায়, যতটুকু মেশিন চালানোর জন্য দরকার। ছাত্রযুবকদের তারা বোঝায় কারিগরি শিক্ষার দ্বারা কাজ পাওয়া যাবে। কিন্তু কে চাকরি দেবে? সরকার ও শিল্পপতিরা দেবেনা, তারা কোনও দায়িত্ব নেবে না। তাই, আওয়াজ তোলা হয়েছে — নিজের কাজ নিজে খুঁজে নাও, সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট।

প্রভাস ঘোষ বলেন, কেন আজ বিজেপি ধর্মীয় শিক্ষার উপর এত জোর দিচ্ছে? লক্ষ্য একটাই — মানুষকে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী করে তোলা। খেতে না পেলে, চিকিৎসা ও শিক্ষা না পেলে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ যাতে না বাড়ে, অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে সবই মেনে নেয়, সেজন্যই জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা, বাস্তুশাস্ত্র শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে আসা হচ্ছে। এ এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ। এর সাথে চলছে ছাত্রযুবকদের চরিত্র, মনুষ্যত্ব ধ্বংস করার মারাত্মক ষড়যন্ত্র। ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জয়ন্তী। ক’ জন তা নিয়ে ভাবে? কজন জানে? এসব ভাবার মন আজ আর মানুষের নেই। একদিন মানুষ ভাবত। সেই মনকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। শাসকরা চায়না, মানুষ ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, নেতাজি, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলকে স্মরণ করুক। যারা স্মরণ করবে, তারা সাহস পাবে, মনুষ্যত্ব পাবে। ফলে সেই মনকে খতম করে দাও। সেজন্যই মদ, গাঁজা, নোংরা ফিল্ম, যৌনতাসর্বস্ব ম্যাগাজিনের ছড়াছড়ি। কেন্দ্রে বিজেপি, রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি-কংগ্রেস, এ রাজ্যে সি পি এম — কোনও পার্থক্য নেই। সি পি এম সরকার ঢালাও মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরা চায় মানুষ অমানুষ হোক, ক্লীব স্বার্থপর হোক, জন্তুর মতো আচরণ করুক। এদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়বে কে? লড়তে হবে ছাত্রযুবকদেরই।

প্রভাস ঘোষ বলেন, দেশের মানুষের মধ্যে এখন হতাশা। তাঁরা বলেন, কোনও দল, কোনও নেতাকে বিশ্বাস নেই, সবাই ঠকায়। দীর্ঘদিন মার খেয়ে খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে। আমাদের দেশে মানুষ দেখে — কোন্ দলের প্রচার বেশি, রেডিও-টিভি-কাগজ কার বেশি প্রচার দেয়। পরাধীন দেশে নেতাজি প্রচার পান নি। গান্ধীবাদীদের পক্ষে প্রচারে দেশ ভেসে গেছে। মানুষ নেতাজিকে চিনতে পারেনি, তারা বোঝেনি কেন নেতাজিকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। অথচ, সুভাষচন্দ্র দেশে থাকলে আগস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকত তাঁর হাতে, দেশের চেহারা পাল্টে যেত। তাই তিনি প্রচার পাননি। আমাদের মানুষ জিজ্ঞাসা করে — এস ইউ সি আই-এর শক্তি কতটুকু? আপনাদের ক’টা এম এল এ, কটা এম পি? আমরা বলি — কংগ্রেস, বিজেপি, সি পি এম, তৃণমূল — এদের অনেক বেশি এম পি, অনেক এম এল এ। কিন্তু তার দ্বারা আপনাদের কী কল্যাণ হচ্ছে বলুন। এম এল এ/এম পি নয়, আসল শক্তি জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, নৈতিক বল, সংগঠনের শক্তি। এই তিনটি জিনিস চাই। সেজন্য আমি ছাত্রদের বলব — রাজনীতি বুঝতে হবে, রাজনীতির বাইরে কিছু নেই। শিক্ষা-চাকরি-খাদ্য-আশ্রয়-পরিবেশ-সংস্কৃতি — সবই রাজনীতির বিষয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দ্বারা সবই নির্ধারিত হয়। তাই বুঝতে হবে কোন্ রাজনীতি শোষণ লুণ্ঠন টিকিয়ে রাখার রাজনীতি। সে রাজনীতি বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, সি পি এম-এর। এদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাকে তোয়াজ করে কীভাবে আরও বেশি ক্ষমতায় থাকা যায়। এদের রাজনীতি বলছে — অন্ধ-অজ্ঞ-কাপুরুষ হও, স্বার্থপর-লোভী হও, মদ-জুয়া-সাট্টার নেশায় ডুবে যাও। বিকল্প আর একটি রাজনীতি এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা নিয়ে গড়ে উঠেছে। সে রাজনীতি হচ্ছে এস ইউ সি আই-এর রাজনীতি, যার দ্বারা এ আই ডি এস ও পরিচালিত হচ্ছে। এই রাজনীতি বলে, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, সুভাষ বোস হও, প্রীতিলতা হও। তাঁদের বিপ্লবী চরিত্রের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে নিজেদের গড়ে তোল। শরৎচন্দ্র, নজরুলের সংবেদনশীল মন নিয়ে নিজেদের গড়ে তোল। আপনাদের ঠিক করতে হবে কোন্ রাজনীতিটা গ্রহণ করবেন।

সভার সভাপতি কমরেড দেবাশিষ রায় বর্ধমানে সম্মেলন করতে গিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ সহ এস এফ আই-এর সৎ কর্মীদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাবার পাশাপাশি কিছু সি পি এম এবং এস এফ আই কর্মী এ আই ডি এস ও’র স্বেচ্ছাসেবকদের কীভাবে হেনস্থা করেছে তার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে, আঘাত হেনে, অত্যাচার চালিয়ে কোনও বিপ্লবী সংগঠনকে কখনও রুখে দেওয়া যায় না। তাই যদি হত তাহলে ৫০ বছর আগে মাত্র ৫ জনকে নিয়ে যে এ আই ডি এস ও’র সূচনা হয়েছিল, এত আক্রমণ সহ্য করেও ভারতবর্ষের ২২টি প্রদেশে তার বিকাশ ঘটতো না। তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতিকে পরাস্ত করে ছিনিয়ে আনতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক, গণতান্ত্রিক শিক্ষার অধিকার।

কমরেড দেবাশিষ রায়ের বক্তব্যের পর আবেগে উচ্ছ্বসিত স্লোগানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ আই ডি এস ও’র ৭ম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন।

পরদিন ২৩ জানুয়ারি, সম্মেলনে আগত ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধিরা স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান যোদ্ধা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকাল ৯টায় বর্ধমান কোর্ট কম্পাউণ্ডে নেতাজি মূর্তির সামনে সমবেত হয়। নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদানের পর নেতৃবৃন্দ সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

এরপর শুরু হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। সুদূর দার্জিলিং থেকে শুরু করে দক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চল — সারা রাজ্যের সব ক’টি জেলা থেকে ১৬৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছে প্রতিনিধি সম্মেলনে। পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছে তরুণ প্রতিনিধি ভোলানাথ কুমার। বাবার মৃত্যুর পর সাংসারিক অনটনে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। পয়সা না থাকলে কেন লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হয় — এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তার এই সম্মেলনে আসা। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলার দিনহাটা থেকে এসেছে ফরহাদ হুসেন, মেখলিগঞ্জ থেকে এসেছে মহম্মদ সামিনার। এরা সকলেই সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে এই সংগঠনটিকে, কারণ তারা বুঝেছে যে শিক্ষার স্বার্থে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে একমাত্র এ আই ডি এস ও-ই আছে তাদের পাশে। সুদূর সুন্দরবনের মৈপীঠ অঞ্চল থেকে বহু বাধা অতিক্রম করে প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছে সুদীপ্ত জানা। তার কথায় এ আই ডি এস ও’র নেতা-কর্মীদের শৃঙ্খলাপরায়ণ রুচিশীল আচার-ব্যবহার তাকে আকর্ষণ করে। বর্ধমান শহরের বাসিন্দা মাহফুজা সাহানা, এই প্রথমবার এল এ আই ডি এস ও সম্মেলনে। সে বুঝে নিতে চায় কেন আজ শিক্ষার উপর এই আক্রমণ। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঠিক রাস্তাটি খুঁজে নিতেই এরা এ আই ডি এস ও সম্মেলনে এসেছে।

প্রতিনিধি অধিবেশনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল বর্ধমান শহরের ‘সংস্কৃতি লোকমঞ্চ’ টিকে। মঞ্চটির নামকরণ করা হয়েছিল সি পি এম-এর ঘাতকবাহিনীর হাতে নিহত ডি এস ও রাজ্য কমিটির সদস্য শহীদ কমরেড অশোক হালদারের নামে। সম্মেলন উপলক্ষে হলটি ব্যানার ও ফেস্টুনে সুন্দরভাবে সাজান হয়েছিল। লোকমঞ্চের প্রাঙ্গণে সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড প্রতাপ সামল কর্তৃক সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও গণআন্দোলনের শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহীদ বেদীতে মাল্যার্পণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রতিনিধি অধিবেশন।

কমরেড প্রদীপ দাসের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। সভায় মূল প্রস্তাব পেশ করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধিরা একাগ্রতার সঙ্গে তা শোনে। মোট ১০৫ জন ছাত্রছাত্রী মূল প্রস্তাবের ওপর সংশোধনী ও সংযোজনী পেশ করে। এছাড়া আরো কিছু প্রস্তাব লিখিতভাবে জমা পড়ে। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গভীর মনোযোগে তারা মূল প্রস্তাবটি পড়েছে, তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছে। সংগঠনের প্রতি তাদের আবেগ যে কত গভীর, তাদের চোখ-মুখ ও বাচনভঙ্গি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এদের দেখে মনে হয়েছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের যত আক্রমণ এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে, ছাত্রজীবনে আসুক না কেন, চ্যালেঞ্জ নিয়ে এরা সেই আক্রমণ নিশ্চয় প্রতিহত করতে পারবে।

প্রতিনিধি অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। কমরেড সুব্রত গৌড়ীকে সভাপতি ও কমরেড নভেন্দু পালকে সম্পাদক করে ৭৩ জনের রাজ্য কমিটি নির্বাচন করে প্রতিনিধিবৃন্দ। শেষ অধিবেশনে কমরেড প্রভাস ঘোষ, ছাত্রদের দেহে-মনে-চিন্তায়-চরিত্রে মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের যথার্থ অনুগামী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

বর্ধমান রাজ কলেজের ‘পদাতিক’ নাট্যগোষ্ঠী প্রথম দিন ‘কিউবা’ নাটক মঞ্চস্থ করে।

কলকাতা বইমেলায়

স্টল নং — ১৭৭

কম দামে সরকারি জমি

একের পাতার পর

চক্রবর্তী এই বিতর্কিত বেচাকেনা সম্পর্কে যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আদৌ স্বচ্ছ নয়। প্রথমত, মন্ত্রী একথা বলেননি যে, সরকার দেউলিয়া এবং সেজন্যই তাড়াহুড়ো করে এটি কম দামে বেচে দেওয়া হয়েছে। বরং তিনি যা বলেছেন, তার অর্থ দাঁড়ায় সরকার যেন ভেবেচিন্তেই শিল্পায়নের স্বার্থে জমি বেসরকারি সংস্থাকে বিক্রি করেছে। শুধু তাই নয়, মন্ত্রী আরও একধাপ এগিয়ে রাজ্য সরকারের ‘শিল্পায়নের ফর্মুলা’ বিজেপি কংগ্রেসের থেকে আলাদা তা বোঝাবার জন্য বলেছেন, ‘‘রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে ওখানে প্রকল্প গড়বে।’’ তবে কী সেই প্রকল্প, মন্ত্রী তা বলতে রাজি হননি। তাঁর কথায় ‘‘কি প্রকল্প, তা এখনই বিস্তারিত বলা যাবে না। কারণ, আলোচনা চলছে। এখনই সব বলা ঠিক হবে না।’’ উত্তরবঙ্গ পরিবহন নিগমের জমিতে এমন কী সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রকল্প হতে পারে, যা খুবই গোপনীয়? তবে, যে প্রোমোটার সংস্থা ঐ জায়গাটি কিনেছে, তার মালিকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তারা জমিতে ‘অত্যাধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে ব্যবসায়ীদের কাছে বেচবেন এবং তাদের এই ব্যবসায় রাজ্য সরকার নেই।’ অর্থাৎ মন্ত্রী ‘যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পের’ যে কথা বলেছেন, সেটা ঠিক নয়। এতেই প্রশ্ন ওঠে, মন্ত্রী একথা বললেন কেন? তিনি কি কিছু আড়াল করতে চান? ক্রেতা ঐ প্রোমোটার সংস্থাকে কি অন্যায়ভাবে মন্ত্রী সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন? এসব প্রশ্নের জবাব সরকারই দিতে পারে। তবে একটি কথা পরিষ্কার যে, কম দামেই সরকারি সম্পত্তি বেচে দেওয়া হয়েছে এবং সেটা করেছে এমন একটি সরকার, যারা ‘টাকা নেই’ ধুয়া তুলে গরিব মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের উপর একের পর এক করের বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net